আহমদীয়াতের পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

‘নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ইসলাম পরিপূর্ণ দীন’
(আলে-ইমরান : ২০)

আহমদীয়াতের পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের দ্বিতীয় খলিফা ও মুসলেহ মাওউদ
হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)-এর উর্দূ ভাষণ
‘পয়গামে আহমদীয়াত’-এর বাংলা ভাবানুবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ

গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.

প্রকাশক | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | মৌলবী আব্দুল হাফিজ মরহুম

একাদশ সংস্করণ | রজব, ১৪৩৭
বৈশাখ, ১৪২৩
মে, ২০১৬

সংখ্যা | ৩,০০০ কপি

মুদ্রণ | **ইন্টারকন এসোসিয়েটস**
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

AHMADIYYATER PAIGAM

আহমদীয়াতের পয়গাম

By **Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad**[RA]
Khalifatul Masih Sani & Musleh Maud

Translated into Bengaly by
Moulvi Abdul Hafiz Morhum

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN : 978 984 991 212-5

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মুখবন্ধ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলিফা ও মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশিরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১ অক্টোবর ১৯৪৮ সালে **'পয়গামে আহমদীয়াত'** নামে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এটা ২ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে প্রথম আল ফযল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতির এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তাই এর গুরুত্ব অনুধাবন করে মোহতরম আব্দুল হাফিজ মরহুম এর বঙ্গানুবাদ করেন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭, তৃতীয় ১৯৬৪, চতুর্থ ১৯৬৫, অষ্টম ১৯৯৬ এবং সর্বশেষ দশম সংস্করণ ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে এর একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

এ পুস্তকটি বঙ্গানুবাদ এবং অতীত ও বর্তমানে প্রকাশনায় যারা যেভাবে কাজ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমিন, সুম্মা আমিন।

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

সূচীপত্র

১.	আহমদীয়াত কি?	৫
২.	আহমদীয়াত কোন নতুন ধর্ম নয়	৫
৩.	আহমদীদের সম্বন্ধে কতগুলো সন্দেহের নিরসন– খতমে নবুওয়াত	১০
৪.	সমগ্র কুরআনে ঈমান	১১
৫.	ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান	১২
৬.	মোজেযা	১৩
৭.	নাজাত	১৫
৮.	হাদীস ও ফেকাহ্‌	১৬
৯.	তকদীর	১৮
১০.	জিহাদ	২০
১১.	স্বতন্ত্র জামা'ত কেন?	২২
১২.	আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রোগ্রাম	২২
১৩.	আহমদীদেরকে অপর সকল হতে পৃথক রাখার কারণ	২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আহমদীয়াতের পয়গাম

আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজিম।
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল্ কারীম।
খোদা কে ফযল অওর রহম কে সাথ।
হুআন্ নাসের।

আহমদীয়াত কি? এটার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই বা কি? জানা ও না-জানা অনেকের মনে এ প্রশ্ন ওঠে। যারা জানেন, তারা গভীরভাবে জানতে চান। যারা জানেন না, তাদের প্রশ্ন তো একান্ত ভাসা ভাসা ধরণের হয়ে থাকে। তারা শুনা কথা বিশ্বাস করেন অথবা কল্পিত ধারণা পোষণ করেন। যারা না জানার জন্য আহমদীয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন; প্রথমে আমি তাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলব:

আহমদীয়াত কোন নতুন ধর্ম নয়

অনভিজ্ঞদের মধ্যে অনেকে মনে করে, আহমদীয়াত একটি নতুন ধর্ম। আহমদীগণ কলেমা— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" পড়ে না। কোন কোন লোকের ভ্রান্ত প্রচারণার ফলে অজ্ঞ লোকেরা এ বিশ্বাস পোষণ করে। মনে করে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই 'কলেমা' থাকা চাই। সুতরাং তারা মনে করে যেহেতু আহমদীয়াত একটি ধর্ম, তারও একটি স্বতন্ত্র কলেমা আছে। সত্য কথা এই যে, আহমদীয়াত কোন নতুন ধর্ম নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেরই 'কলেমা' থাকে না। ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মেরই 'কলেমা' নেই। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ যেমন ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য, ইসলামের নবী যেমন ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইসলামের বিশ্বজনীনতা যেমন একটি বৈশিষ্ট্য তদ্রূপ ইসলামের কলেমাও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

ধর্মগ্রন্থ সকল ধর্মেরই আছে, কিন্তু একমাত্র ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মেরই 'কালামুল্লাহ্' বা 'আল্লাহ্র বাণী' নেই। ধর্মগ্রন্থ বলতে ধর্মের বিবরণ বুঝায়, সেখানে থাকে কর্তব্য ও আদেশের বিবরণ। ধর্মগ্রন্থ বলতে একথা বুঝায় না যে, সেটির প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্র নিকট হতে এসেছে। ইসলামের পুস্তককে 'কালামুল্লাহ' বলা হয়। কেননা এখানে বর্ণিত বিষয়-বস্তুই কেবল আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ হয় নি; বরং সেটির প্রত্যেকটি বাক্য,

প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। হযরত মূসা আলায়হেস সালামের পুস্তকের বিষয়-বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ্ জানিয়েছিলেন; তাদের পুস্তক আল্লাহ্র ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি নয়। একটু মনোযোগ দিলে যে কেউ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের বিষয়-বস্তু ঐশী হলেও, বাক্যগুলো ঐশী নয়। অনুরূপভাবে এটাও সিদ্ধান্ত করতে পারবে যে, কুরআন শরীফের বিষয়-বস্তু এবং বাক্যসমূহ উভয়ই ঐশী। কুরআন, তওরাত বা ইঞ্জিলের প্রতি যার বিশ্বাস নেই, এ তিন পুস্তক আলোচনা করলে তিনিও বলতে বাধ্য হবেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের রসূলদ্বয় এ দু'পুস্তককে আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ বলে দাবি করছেন বটে কিন্তু আল্লাহ্র রচিত বাক্য-বাণী বলে দাবি করেন নি। পক্ষান্তরে তিনি এটাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, কুরআনের রসূল কুরআনের বিষয়-বস্তু এবং রচনা উভয়কেই আল্লাহ্র নিকট হতে অবতীর্ণ বলে দাবি করেছেন। এ কারণে কুরআন করীম 'কিতাবুল্লাহ্' (আল্লাহ্র পুস্তক) এবং 'কালামুল্লাহ্' (আল্লাহ্র কথা) হবার এ দ্বিবিধ দাবি করে; কিন্তু তওরাত ও ইঞ্জিল নিজে 'কালামুল্লাহ্' হবার দাবি করে নি এবং কুরআন শরীফও সেগুলিকে 'কালামুল্লাহ্' বলে নি। অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের 'কালামুল্লাহ্' না হওয়া এবং ইসলামের ধর্ম-গ্রন্থ 'কুরআন'-এর 'কালামুল্লাহ্' হওয়া, ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এভাবে প্রত্যেক ধর্মেরই কোন না কোন নবী আছেন, কিন্তু কোন ধর্মেরই এমন নবী নেই যিনি যুক্তির মাধ্যমে ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় সত্যের প্রচার করেছেন এবং যিনি বিশ্ব মানবের জন্য পূর্ণ আদর্শ বলে দাবি করেছেন। খ্রিষ্টধর্ম ইসলামের নিকটতম ধর্ম। খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈসা আলাইহেস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে। আল্লাহর পুত্র হলে তাঁর পক্ষে মানুষের জন্য আদর্শ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ মানুষ খোদার মত হতে পারে না। তওরাত হযরত মূসা আলাইহেস সালামকে আদর্শ মানব বলে দাবি করে না। হযরত মূসা বা হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম যুক্তি সহকারে ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় সত্য ব্যক্ত করেছেন বলেও তওরাত কিংবা ইঞ্জিল দাবি করে নি। কুরআন করীমে হযরত রসূলে করীম (সা.) সম্বন্ধে এরূপ দাবি আছে। কুরআন করীমে আঁ-হযরত (সা.) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ তিনি ধর্ম-বিধান ও ধর্ম-বিধানের যুক্তিসমূহ শিক্ষা দেন (সূরা বাকারাহ্, রুকূ ১৮)। ইসলামের নবী শুধু উত্তম আদর্শই স্থাপন করেন নি, বরং কুরআনের প্রত্যেক বিধানে আপন পর সকলের জন্যই যে উপযোগিতা ও উপকারিতা রয়েছে তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। জোর করে কোন বিধান মানতে রসূলে করীম (সা.) কাউকেও বাধ্য করেন নি, এভাপে তিনি তাঁর

উম্মতের ঈমান দৃঢ় করেছেন; তাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্যম সৃষ্টি করেছেন, নিজেকে আদর্শরূপে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া এমন নবী একমাত্র ইসলামেরই আছে। এটাও ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য।

সার্বজনীনতা ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, প্রভু-ভৃত্য, শক্তিমান-শক্তিহীন, শাসক-শাসিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, ক্রেতা-বিক্রেতা, দেশী-বিদেশী, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, সাবালক-নাবালক সকলের জন্য ইসলাম সুখ, শান্তি ও উন্নতির বাণী এনেছে। মানব জাতির কোন অংশকেই ইসলাম বঞ্চিত করে নি। নতুন ও পুরাতন সকল জাতিকেই ইসলাম পথ প্রদর্শন করে। 'আলিমুল গায়েব' খোদার দৃষ্টি যেমন আকাশের উজ্জলতম নক্ষত্র হতে পাতালের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর উপরেও পতিত হয়, ইসলামের শিক্ষাও ঠিক তদ্রূপ ধনকুবের হতে দীন-হীন পর্যন্ত সকলেরই প্রয়োজন মেটায়।

ইসলাম অতীত ধর্মসমূহের অনুকরণ নয়। এটা ধর্ম ব্যবস্থার চরম পরিণতি। আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য। এর প্রত্যেকটি অঙ্গ পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে ছিল মনে করা ভুল। নামের দিক দিয়ে হীরা ও কয়লা উভয়েই কার্বন। কিন্তু হীরা কয়লা নয়। সাধারণ পাথর ও মর্মর পাথর উভয়ই পাথর; কিন্তু পাথর মাত্রই মর্মর পাথর নয়। তদ্রূপ যদিও সকল ধর্মই ধর্ম তথাপি ইসলাম ইসলামই; ইসলাম এবং অন্য ধর্ম সমান নয়। ইসলামের 'কলেমা' আছে। এ কারণে সকল ধর্মেরই কলেমা ছিল মনে করা ভুল।

কুরআন করীমের প্রতি মনোযোগী না হবার কারণে এ ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মূসা কালীমুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রূহুল্লাহ্ কলেমা সৃষ্টি করা হয়েছে। তওরাত, ইঞ্জিল বা খ্রিষ্টিয় সাহিত্যে এ সকল 'কলেমা'র নামগন্ধও নেই। মুসলমান সমাজে বহু দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে মুসলমান 'কলেমা' ভুলে যায় নি। অতএব, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পক্ষে 'কলেমা' ভুলে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? আর তারাই যদি ভুলে গিয়ে থাকে এবং তাদের পুস্তকেও যখন নেই তখন এসকল কলেমার সন্ধান পাওয়া গেল কোথায়? সত্য কথা এই যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যতীত আর কোন নবীরই 'কলেমা' ছিল না। এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যা অপর কোন নবীর ছিল না।

আঁ-হযরত (সা.) ব্যতীত আর কোন রসূলের কলেমা না থাকার কারণ এই যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"– আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই উপাসনার যোগ্য নয়–

একটি স্থায়ী সত্য; এর সাথে স্থায়ী বৈ অস্থায়ী রসূলের নাম যুক্ত হতে পারে না। আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্ববর্তী রসূলগণের 'রেসালাত' (ঐশী বার্তা) অস্থায়ী ছিল; নির্দিষ্ট কাল পরে তাঁদের 'রেসালাতের' পরিসমাপ্তি ঘটার ছিল; আঁ-হযরত (সা.)-এর "রেসালাত" শেষ হবার নয়; কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এ কারণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর" সাথে "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সংযুক্ত হতে পারে, আর কোন রসূলের নাম সংযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা স্বয়ং কলেমার দাবি করে না, অথচ মুসলমানগণ যাদেরকে নির্দিষ্টভাবে কলেমার কল্যাণে বিভূষিত করা হয়েছে, তারা উদারতা দেখিয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য কলেমা তৈরি করে দিয়েছে।

প্রত্যেক ধর্মেরই 'কলেমা' থাকা আবশ্যক নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই যদি 'কলেমা থাকত, তবুও আহমদীয়াতের কোনও নতুন কলেমা থাকতে পারে না। কারণ আহমদীয়াত কোনও নতুন ধর্ম নয়, এটা ইসলামেরই নামান্তর মাত্র। তাই, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়ার সামনে যে 'কলেমা' পেশ করেছিলেন, সে 'কলেমা' "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"ই আহমদীয়াতের 'কলেমা'।

আহ্মদীগণ বিশ্বাস করে যে, এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনি 'ওয়াহেদ ও লা-শরীক' (এক-অদ্বিতীয় এবং অংশীবিহীন) অনন্ত শক্তির অধিকারী, 'রব' (বিশ্বপালক প্রভু), 'রহমান' (অযাচিত অসীমদাতা), 'রহীম' (পরম দয়াময়), 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক)'। কুরআন শরীফে বর্ণিত যাবতীয় গুণই তাঁর। কুরআন শরীফ তাঁকে যে সকল দোষ হতে মুক্ত বলে সেসকল হতে তিনি মুক্ত। আহ্মদীদের বিশ্বাস এই যে, মুহাম্মাদ বিন্ আবদুল্লাহ্ বিন্ আবদুল মোত্তালিব কুরায়শী মক্কী (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল ছিলেন, তাঁর প্রতি শেষ শরীয়ত কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল। আরবের লোক, আরবের বাইরের লোক, সাদা-কালো প্রত্যেক জাতির জন্যই আল্লাহ্ তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নবুওয়ত ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতদিন ভূপৃষ্ঠে একজন মানুষও বাস করবে। তাঁর অনুসরণ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তাঁর দাবি জ্ঞান গোচরে আসার পরেও যে ব্যক্তি তাঁকে অনুসরণ করবে না, আল্লাহর বিচারে সে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। তাঁর দাবির প্রমাণ যে ব্যক্তির কাছে পৌঁছেছে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত সে ব্যক্তির পরিত্রাণ ও সাফল্যের জন্য আর কোন পথ নেই। তাঁকে অনুসরণ করাই পবিত্রতা অর্জনের একমাত্র পথ।

আহ্‌মদীদের সম্বন্ধে কতগুলো সন্দেহের নিরসন– খতমে নবুওয়াত

অনেকে মনে করে যে, আহ্‌মদীগণ 'খতমে নবুওয়াত' স্বীকার করে না এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে "খাতামান নাবীঈন" বলে বিশ্বাস করে না। এটা একটি ধোঁকা বৈ আর কিছুই নয় এবং এটা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আহ্‌মদীগণ নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং 'কলেমা শাহাদাত' পড়ে। তাদের পক্ষে 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভব? আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে "খাতামান নাবীঈন" না বলাই বা কিরূপে সম্ভব? আল্লাহ তা'লা বলেছেন, **"মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মিররিজালিকুম ওয়ালাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবীঈন"–**

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও খাতামান নাবীঈন (সূরা আহযাব : ৪১ আয়াত)। কুরআন শরীফের প্রতি ঈমান রেখে তারা কিরূপে আল্লাহর এ স্পষ্ট উক্তি অগ্রাহ্য করতে পারে?

আহ্‌মদীগণ নিশ্চয়ই এ কথা বলে না যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম "খাতামান নাবীঈন" নন। তারা কেবল এ কথা বলে যে, "খাতামান নাবীঈন" শব্দযুগলের যে অর্থ মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত আছে, উল্লিখিত আয়াত (বাক্য) তা সমর্থন করে না; আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের যে উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, ঐ প্রচলিত অর্থ হতে তা প্রকাশ পায় না।

আহ্‌মদীয়া জামা'ত "খাতামান নাবীঈন" শব্দ-যুগলের যে অর্থ করে, তা আরবী ভাষা ও অভিধান সম্মত। আহ্‌মদীদের কৃত অর্থ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযী আল্লাহু আনহা, হযরত আলী রাযী আল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবাগণের দ্বারা সমর্থিত এবং সে অর্থ সকল মানুষের উপরে আঁ-হযরত (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। আহ্‌মদীগণ "খতমে নবুওয়াত" অস্বীকার করে না, "খতমে নবুওয়াতের" প্রচলিত ভ্রান্ত অর্থ অস্বীকার করে। "খতমে নবুওয়াত" অস্বীকার করা কুফরী কাজ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আহ্‌মদীগণ মুসলমান এবং ইসলামের অনুসরণকেই তারা মুক্তির একমাত্র উপায় বলে জ্ঞান করে।

['খাতামান্ নাবীঈন' কুরআন মজীদের সূরা আহযাবের একটি আয়াতাংশ যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর শান, মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে বর্ণিত

হয়েছে। জামা'তে আহ্‌মদীয়া আঁ-হযরত (সা.)-কে 'খাতামান নাবীঈন' বলে বিশ্বাস করে, যেমনঃ (ক) নবুওয়াত ও শরীয়তের কামালিয়তের (পূর্ণতা ও চরমোৎকর্ষতা) দিক হতে তিনি অবশ্যই শেষ নবী; (খ) তাঁর পরে কেবল তাঁর উম্মতের মধ্য হতে তাঁকে পায়রবী (পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ) করে তাঁর আরদ্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য তাঁরই রূহানী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কেউ উম্মতি নবী-রসূল হবার মোকামও লাভ করতে পারেন; (গ) হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পরে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন ধর্মের পুরাতন বা নতুন তথা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী এবং শরীয়ত আগমনের বিশ্বাস কুফরীর শামেল।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের এ বিশ্বাস সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বিশ্বাস আঁ-হযরত (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয় কর্তৃকও সমর্থিত। যেমন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– "আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং তুমি খাতামাল আওলিয়া, হে আলী"। (তফসীরে সাফী)। হযরত রসূলে করীম (সা.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেছিলেন– "নবুওয়াতে আমি যেমন খাতামান নাবীঈন হিজরতে আপনি তদ্রূপ খাতামাল মুহাজেরীন" (কানযুল উম্মাল)।

এখানে উভয় হাদীসেই 'খাতাম' শব্দ শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের অর্ধাংশের শিক্ষয়িত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেনঃ

قُوْلُوْا اَنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ ـــ

"তোমরা তাঁকে [আঁ-হযরত (সা.)-কে] "খাতামুল আম্বিয়া" বলবে, 'তাঁর পর কোন নবী নেই'- একথা বলো না।" (তাকমেলা মাজমাউল বিহার পৃঃ ৮৫; তফসীর আল-দুররুল মানসুর ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৪)। এটা হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে হযরত উম্মুল মু'মেনীন আয়েশা (রা.) 'খাতামুল আম্বিয়া' বলতে প্রচলিত অর্থ– তাঁর পরে কোন নবী নেই অর্থ গ্রহণ করতে এবং এটাকে প্রচার করতে সমগ্র উম্মতকে নিষেধ করেছেন।

খতমে নবুওয়াত সম্বন্ধে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমতও প্রণিধানযোগ্য: "কিতাবুল মাসাহিফ"–এ ইবনুল আম্বারী বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান আসলামী বলেছেন, "আমি হাসান ও হুসাইনকে কুরআন করীম পড়াতাম (অর্থাৎ তাদেরকে কুরআন পড়াবার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন)। একদিন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। আমি তখন "খাতেমান নবীঈন" (অর্থাৎ 'তা'- হরফে জের দ্বারা) পড়াচ্ছিলাম (যার

অর্থ হয় খতমকারী-অনুবাদক)। হযরত আলী (রা.) তা শুনে বললেন, "তুমি আমার পুত্রদেরকে ('তা'- হরফে জের দ্বারা) খাতেমান-নবীঈন" পড়িও না, বরং 'তা' হরফে জবরের সাথে– 'খাতামান-নবীঈন' পড়াবে। আল্লাহ্ তওফিক দিন।"– (তফসীরে কবীর, সুরা কওসারের তফসীরের অধীন)।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা.)-এর মতে খাতামান-নবীঈনের সে অর্থ সমর্থিত নয়, যা কিনা 'তা'- হরফে জের দিয়ে প্রতিপাদিত হতে পারে, তাই তিনি জের দিয়ে পড়াতে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত ইবনে আরাবী (রহ.) হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ (রহ.), হযরত ইমাম আলী ক্বারী (রহ.), হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী (রহ.), দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাশেম নানুতবী (রহ.) প্রমুখ বুযুর্গান কর্তৃকও এ মতবাদ সমর্থিত। (দুররে মনসুর, ফতুহাতে মক্কীয়া, তফহিমাতে এলাহিয়া, মকতুবাত ইমাম রব্বানী, আল ইয়াওয়াকিত আল জাওয়াহের, তাহযীরুন নাস প্রভৃতি কিতাব দ্রষ্টব্য– প্রকাশক।]

সমগ্র কুরআনে ঈমান

অনেকে মনে করে, আহমদীগণ সমগ্র কুরআন শরীফ মানে না, আংশিকভাবে মানে। সম্প্রতি কোয়েটার অনেকেই আমাকে বলেছে যে, আলেমগণ তাদেরকে এ কথা বলেছেন। এটা আহমদীয়াতের শত্রুদের রচিত একটি মিথ্যা অপবাদ বৈ আর কিছুই নয়। আহমদীগণ কুরআন শরীফ অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করে। কুরআন শরীফের "বিসমিল্লাহ" হতে "আন্ নাস" পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দকে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ এবং অবশ্য মান্য বলে মনে করে।

ফিরিশ্তার প্রতি ঈমান

কেউ কেউ বলে, আহমদীগণ ফিরিশ্তা ও শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এটাও একটি মিথ্যা অপবাদ। কুরআন শরীফে ফিরিশ্তা ও শয়তানের উল্লেখ আছে। আহমদীগণ কুরআন শরীফের উপর বিশ্বাস রেখে কিরূপে তা অস্বীকার করতে পারে। খোদার ফযলে ফিরিশ্তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস তো আছেই, অধিকন্তু আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, কুরআন শরীফ অনুসারে চলে ফিরিশ্তার সংসর্গ লাভ করা যায়, ফিরিশ্তার নিকট হতে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়। এ প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং ফিরিশ্তার নিকট হতে অনেক কিছু শিখেছে। একদা এক ফিরিশ্তা আমাকে সূরা ফাতেহার তফসীর শিখিয়েছিলেন। আর তখনই

সূরা ফাতেহার জ্ঞান অফুরন্তভাবে আমার নিকট খুলে গিয়েছে। আমি দাবি করে বলছি যে, অন্য যে কোন ধর্মের লোক তার সমগ্র ধর্মগ্রন্থ হতে যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে, খোদার ফযলে তা হতে অনেক বেশী জ্ঞান আমি শুধু সূরা ফাতেহা হতেই বর্ণনা করতে পারি। বহুদিন হতে আমি এ দাবি করছি। কিন্তু কেউই আমাকে পরীক্ষা করতে আসে নি। আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ, রসূলের আবশ্যকতা, পূর্ণ শরীয়তের লক্ষণাবলী, মানবমণ্ডলীর জন্য তার প্রয়োজনীয়তা, দোয়া, তকদীর, হাশর-নাশর (মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান), বেহেশ্‌ত ও দোযখ ইত্যাদি সম্বন্ধে সূরা ফাতেহা হতে যে আলোক পাওয়া যায়, অন্য ধর্ম গ্রন্থের শত শত পৃষ্ঠা পাঠ করেও তা পাওয়া যায় না। ফল কথা ফিরিশ্‌তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা তো দূরের কথা, বরং ফিরিশ্‌তা হতে আহমদীরা উপকৃত হচ্ছে বলে তাদের দাবি।

শয়তান তো একটা ঘৃণিত সত্তা। তার প্রতি ঈমানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। হাঁ, কুরআন শরীফ হতে শয়তানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তার অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি। তার রাজত্বের অবসান করার দায়িত্ব আল্লাহ তা'লা আমাদের প্রতি ন্যস্ত করেছেন। স্বপ্নে আমি শয়তানকে দেখেছি। তার সাথে আমার কুস্তিও হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও 'তাউযের' (আউযুবিল্লাহ্‌ পাঠের) পুণ্য প্রভাবে আমি তাকে পরাভূত করেছি। আল্লাহ্‌ আমাকে একদা স্বপ্নে বলেছিলেন যে, "তোমাকে যে কার্যভার দেয়া হবে, সে পথে শয়তান ও তার বংশধরগণ অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এ সকল অন্তরায় গ্রাহ্য করো না। 'খোদাকে ফযল আওর রহমকে সাথ' (আল্লাহর কৃপায় ও কল্যাণে) বলতে বলতে অগ্রসর হতে থেকো। তারপর আমি সে দিকে চললাম যে দিকে যাবার জন্য ঐ স্বপ্নে আল্লাহ্‌ আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর দেখলাম শয়তান ও তার বংশধরগণ আমাকে শাসাচ্ছে এবং নানাভাবে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে। কোথাও দেখি শুধুই মাথা, কোথাও দেখি শুধু মস্তকহীন দেহ আমার দিকে আসছে, কোথাও দেখি শয়তান বাঘ, চিতা ও হাতীর আকার ধারণ করে আসছে। "খোদাকে ফযল অওর রহমকে সাথ" বলতে বলতে আমি অগ্রসর হতে থাকলাম। এ বাক্য উচ্চারণ করা মাত্র শয়তান পলায়ন করছিল এবং পরক্ষণে অন্য আকার ধারণ করে আবার আসছিল। আবার এ বাক্য উচ্চারণ করে আমি তাকে বিনাশ করছিলাম। অবশেষে আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছলাম, শয়তান ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। সে অবধি আমি আমার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ লেখার শিরোনামায় এ বাক্য লিখে আসছি। ফল কথা আমরা ফিরিশ্‌তার প্রতি ঈমান রাখি এবং শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করি।

মোজেযা

কেউ কেউ বলে, আহমদীগণ 'মোজেযা' (ঐশী নিদর্শন) বিশ্বাস করে না। বাস্তব সত্য এর বিপরীত। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মোজেযা তো আছেই, তাঁর সত্যিকার অনুসারীকেও আল্লাহ্ মোজেযা দেন। কুরআন শরীফ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মোজেযায় পরিপূর্ণ। একমাত্র চির অন্ধ ব্যক্তিই এ কথা অস্বীকার করতে পারে।

নাজাত

কেউ কেউ এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, আহমদীদের মতে, আহমদী ব্যতীত আর সকল লোকই জাহান্নামে যাবে। এ অপবাদ অজ্ঞতা বা শত্রুতা প্রসূত। আমরা নিশ্চয়ই এরূপ মনে করি না। আমাদের মতে আহমদীর পক্ষেও জাহান্নামে যাওয়া সম্ভব, এবং যারা আহমদী নন, তাদের পক্ষেও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব। ধর্মে মৌখিক স্বীকারোক্তি কাউকে জান্নাতের অধিকারী করে না, ধর্মের আরোপিত দায়িত্ব পালনের পরেই জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়। তদ্রূপ মৌখিক অস্বীকারের ফলেও কেউ জাহান্নামী হয় না, জাহান্নামী হওয়া বহু শর্ত সাপেক্ষ। যত বড় সত্যই হোক না কেন, পূর্ণভাবে জেনে বুঝে স্বজ্ঞানে অগ্রাহ্য না করলে, কেউই জাহান্নামী হয় না স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শৈশবে যাদের মৃত্যু হয়, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাদের বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে, যারা বনে জঙ্গলে ও পর্বতে থাকে, যাদের বুদ্ধি নেই অথবা যারা পাগল, তাদেরকে কোন হিসাব দিতে হবে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের নিকট নবী পাঠাবেন এবং তাদেরকে সত্য মিথ্যা বিচার করে দেখার সুযোগ দিবেন। তখন যারা সত্য গ্রহণ করবে, তারা জান্নাতে যাবে এবং যারা অগ্রাহ্য করবে তারা জাহান্নামে যাবে।

নাজাত (মুক্তি) সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, যারা সত্য বুঝে চেষ্টা করে না, সত্য মানতে হবে এ ভয়ে যারা তাতে কান দেয় না, সত্যকে সত্য বলে বুঝতে পারা সত্ত্বেও যারা তা গ্রহণ করে না, শুধু তারাই শাস্তির পাত্র। কিন্তু আল্লাহর দয়া অসীম, এরূপ ব্যক্তিদেরকেও ক্ষমা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। আল্লাহর কৃপা বিতরণের ভার আমাদের হাতে নেই। দাঁস তাঁর প্রভুকে দান করা হতে বিরত রাখতে পারে না। তিনি সৃষ্টিকর্তা, প্রভু, প্রতিপালক এবং সর্বাধিপতি। আমরা তাঁর দাঁস। আমাদের দৃষ্টিতে যার নাজাত অসম্ভব, তাঁর অসীম জ্ঞান ও

কৃপায় এরূপ ব্যক্তিও যদি ক্ষমা লাভ করে, তাতে আমরা আপত্তি করার কে? তাঁর দানের হাতকে রোধ করার আমরা কে?

নাজাত সম্বন্ধে আহমদীদের ধারণা এত উদার যে, এ কারণে কোন কোন মৌলবী তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, কেউই চিরকাল দোযখে থাকবে না। কুরআন করীমে আল্লাহ্ বলেছেন, رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ আমার অনুগ্রহ সকল পদার্থকে ঘিরে রয়েছে (৭:১৫৭)। فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ দোযখ কাফেরের মা (১০১:১০)। অর্থাৎ, দোযখের সাথে কাফেরের সম্বন্ধে মায়ের সাথে সন্তানের সম্বন্ধের অনুরূপ হবে। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ আমার উপাসনা করার জন্যই জিন্ন ও ইনসানের সৃষ্টি করেছি (৫১:৫৭)। এরূপ আরো বহু আয়াত আছে। অতএব, আল্লাহর এ সকল উক্তির বিরুদ্ধে আমরা কিরূপে বিশ্বাস করতে পারি যে, দোযখবাসীদের প্রতিও এক সময়ে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে না? সন্তান চিরকাল মাতৃগর্ভে থাকে না। আমরা কিরূপে বিশ্বাস করব যে, নরকবাসী কখনও নরকের গর্ভ হতে বাইরে আসবে না? আর কিরূপে বিশ্বাস করব যে, চিরকালই কতক লোক শয়তানের দাঁস থেকে যাবে এবং কখনও তারা আল্লাহর দাস হবে না, যে জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল? আর কিরূপেই বা এ কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, আল্লাহর প্রেম কখনও তাদেরকে বলবে না যে فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي –আমার দাঁস হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর (৮৯:৩০-৩১)।

হাদীস ও ফিকাহ্

অনেকের এ ভুল ধারণা আছে যে, আহমদীগণ হাদীস ও ফিকাহ্ মানে না। এ দু'টি ধারণাই ভ্রান্ত। আহমদীগণ ফিকাহ্বিদ ইমামগণকে অবশ্যই মানে তবে আঁ-হযরত (সা.) যে কথা বলেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তার বিরুদ্ধে কোন কথাই আহমদীরা মানে না। তাঁর উক্তি বিরুদ্ধ কথা মানলে তাঁকে অবমাননা করা হয়। গুরুর শিক্ষা গ্রহণ না করে শিষ্যের শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। ইমামগণ যত বড়ই হোন না কেন, আঁ-হযরতের (সা.) শিষ্য ও সেবক বৈ আর কিছুই ছিলেন না। এ শিষ্যত্ব ও সেবকত্বের কারণেই তাঁদের যাবতীয় মর্যাদা ও সম্মান। আঁ-হযরতের (সা.) কথাই শেষ কথা, তাঁর কথার উপরে আর কেউ কিছু বলতে পারে না।

আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতি যে সকল কথা আরোপ করা হয়, তা সত্য সত্যই তিনি বলেছেন কিনা তা বুঝার সহজ উপায় এই যে, কুরআনের উক্তি

বিরুদ্ধ কোন কথাই আঁ-হযরত (সা.)-এর উক্তি নয়। কুরআনের উক্তিকে রদ করার বা এর বিরুদ্ধে কিছু বলার কারো অধিকার নেই। হাদীসের বর্ণনাকারীগণ মানুষই ছিলেন। তাঁদের মধ্যেও ভাল মন্দ ছিল; বুঝার ক্ষমতারও তারতম্য ছিল। মোহাদ্দেসীন বা হাদীসবিদ আলেমগণ স্বীকার করেন যে, হাদীস গ্রন্থসমূহে যে সকল কথা দেখা যায়, তার কতক নিশ্চয়ই আঁ-হযরত (সা.)-এর উক্তি ('কাতাঈ'), কতক গ্রহণযোগ্য ('আম'), কতক সন্দেহযুক্ত ('মশকুক') কতক সম্ভাবিত ('যন্নী') কতক জাল বা কৃত্রিম ('অজাঈ')। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফ সন্দেহের অতীত। এ কারণে কুরআনের বিরোধী কোন কথাকে হাদীস বলে স্বীকার করা যায় না। আর যে সকল হাদীস কুরআন বিরোধী না হলেও সত্য সত্যই আঁ-হযরত (সা.)-এর উক্তি কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন এবং যার একাধিক অর্থ হতে পারে, তার সম্বন্ধে ইমামগণ মত দেবার অধিকারী। কুরআন ও হাদীসের অনুশীলনে তাঁরা সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। যে সকল মুসলমান এভাবে কুরআন ও হাদীস চর্চা করে নি এবং যাদের এরূপ যোগ্যতাও নেই, তাদের একথা বলার অধিকার নেই যে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক প্রভৃতি ইমামগণ আমাদের মতই একজন মুসলমান ছিলেন, আমরা তাঁদের অভিমত গ্রহণ করব কেন? চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারের কথাই গ্রহণযোগ্য, আইন ঘটিত ব্যাপারে আইনজীবির কথাই গ্রহণযোগ্য, ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও ইমামগণের কথাই গ্রহণযোগ্য, ধর্মের অনুশীলনই ছিল তাঁদের সারা জীবনের সাধনা। তাঁদের বিচার-শক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁদের প্রতি আল্লাহর ব্যাবহার হতেও তাঁদের ধর্ম-পরায়ণতা ও পবিত্রতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ফল কথা, আহমদীগণ 'মুকাল্লিদ' (যারা ইমাম মানে যেমন হানাফী) বা 'গায়ের মুকাল্লিদ' (যারা ইমাম মানেনা যেমন আহলে হাদীস), কারো কথাই ষোলআনা মানে না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর ন্যায় আহমদীগণও বলে যে, কুরআন সকলের উপরে, তারপর হাদীস এবং হাদীসের নিম্নে ইমামগণের অভিমত। আহমদীগণ কোন কোন বিষয়ে হানাফী এবং কোন কোন বিষয়ে আহলে হাদীস। অন্য কথায়, আহমদীগণ ইমাম আবু হানিফার নীতি স্বীকার করে। কিন্তু ইমামদের কোন অভিমত প্রামাণিক হাদীসের বিরুদ্ধে থাকলে তা মানে না।

তকদীর

অজ্ঞ লোকদের আর একটা ভুল ধারণা এই যে, আহমদীগণ 'তকদীর' মানে না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'লার নির্দিষ্ট 'তকদীর' আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে; কেউই তার পরিবর্তন করতে পারে না। তবে চোরের চুরি করা, বে-

নামাযীর নামায না পড়া, মিথ্যাবাদীর মিথ্যা বলা, প্রতারকের প্রতারণা, খুনীর খুন করা, ব্যাভিচারীর ব্যাভিচার প্রভৃতি কু-কাজ ও অপরাধকে আল্লাহর নির্দিষ্ট তকদীর বলে আমরা মানি না। এ তো নিজের মুখের কালিমা খোদার মুখে লেপন করার চেষ্টা মাত্র। তকদীর ও তদবীর চির প্রবহমান দু'টি সমান্তরাল স্রোতস্বিনী। এদের একটি অন্যটির গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে না; আল্লাহ্ বলেছেন, بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ -এতদুভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানকারী বিদ্যমান আছে; এরা তা অতিক্রম করতে পারে না (আর-রহমান, ২১ আয়াত)। তদবীর তদবীরের ক্ষেত্রে কাজ করছে, তকদীর তকদীরের ক্ষেত্রে কাজ করছে। যেখানে তকদীর অবশ্যম্ভাবী, তদবীরে সেখানে কোন ফল হয় না। আর যেখানে তদবীরের পথ আছে সেখানে তকদীরের ভরসায় বসে থাকার অর্থ নিজের হাতেই নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করা। তকদীরের আবরণে অনেকে তাদের দুষ্কৃতি ঢাকতে চেষ্টা করে; আলস্য ও কর্ম বিমুখতার প্রশ্রয় দেয়। তদবীরের ক্ষেত্রে তকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকার ফল সর্বদাই অশুভ এবং সর্বনাশের হেতু। তকদীরের উপর ভরসা করে মুসলমান তদবীরের ক্ষেত্রেও তদবীর করে নি। ফলে তাদের ধর্ম গিয়েছে; পার্থিব সম্পদও গিয়েছে। তদবীরের ক্ষেত্রে তকদীরের ভরসায় বসে না থাকলে তাদের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হত না।

জিহাদ

আহমদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে আর একটা ভুল ধারণা এই যে, তারা জিহাদে অবিশ্বাসী। এ ধারণা ঠিক নয়। আহমদীগণ জিহাদের আবশ্যকতা স্বীকার করে। তাদের মতে যুদ্ধ দু' প্রকারের, পার্থিব যুদ্ধ এবং ধর্ম যুদ্ধ বা জিহাদ। শত্রু যখন বাহুবলে ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে, তরবারীর ভয় দেখিয়ে ঈমান নষ্ট করতে উদ্যত হয়, ধর্ম রক্ষার জন্য তখন যে যুদ্ধ করা হয় তাই জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধ। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হলে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তবে জিহাদের একটি অপরিহার্য শর্ত আছে। জিহাদ করতে হলে প্রথমেই ইমাম বা নেতা আবশ্যক; এবং নেতার পক্ষ হতে জিহাদের ঘোষণা হওয়া আবশ্যক; নেতা যাকে প্রথমে যুদ্ধে আসতে আহ্বান করবেন, প্রথমে তারই আসা আবশ্যক, এবং অবশিষ্ট মুসলমানের আসার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ইমাম যাদেরকে জিহাদের জন্য আহ্বান করেন, না আসলে শুধু তারাই আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। অবশিষ্ট মুসলমান অপরাধী হবে না। ইমাম না থাকলে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত ফরয হয়ে দাঁড়ায় এবং জিহাদ না করলে প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহর কাছে অপরাধী হয়।

আহমদীগণের ধারণা এই যে, ইংরেজ অস্ত্রবলে ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে নি। এ কারণে তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ সমর্থন করে নি। আহমদীদের এ ধারণাকে যে সকল আলেম ভুল মনে করেন, তাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন কি? ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরয হয়ে থাকলে আহমদীগণ তো আল্লাহর কাছে এ জবাব দিবে যে, আমরা বুঝতে ভুল করেছিলাম; জিহাদ আবশ্যক মনে করি নি বলে আমরা জিহাদ করি নি। কিন্তু যে সকল আলেম ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরয মনে করেন, অথচ জিহাদ করেন নি, আল্লাহর কাছে তাঁরা কি জবাব দিবেন? তাঁরা কি এ কথা বলবেন যে, হে আল্লাহ্! জিহাদের সময় তো এসেছিল; জিহাদ করাকে ফরযও মনে করেছিলাম কিন্তু জিহাদ করার মত সাহস আমাদের ছিল না। যাদের সাহস ছিল তাদেরকেও জিহাদ করার জন্য বলতে সাহস পাই নি। আমাদের ভয় হত যে,ইজহাদের কথা বললে ইংরেজ আমাদেরকে জেলে দিবে। এ দু' উত্তরের মধ্যে কোন্ উত্তর আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

স্বতন্ত্র জামা'ত কেন?

যাঁরা আহমদীয়াত সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান রাখেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে এখন কিছু বলব। তাঁরা জানেন যে, আহমদীগণ তওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিও বিশ্বাসী, তারা কুরআন, হাদীস মেনে চলে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হাশর-নাশর (পুনরুত্থান) বিশ্বাস করে, জাযা-সাজা (পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি) হবে বলে বিশ্বাস করে। তাঁদের আপত্তি এই যে, আহমদীগণ একটা নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে অনর্থক মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এনেছে।

স্বতন্ত্র জামা'ত কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে। যুক্তির সাহায্যে এবং আধ্যাত্মিক ভাবে।

যুক্তির দিক হতে বক্তব্য এই যে, জামা'ত বলতে লোক সংখ্যাকে বুঝায় না; হাজার, লক্ষ বা কোটি লোককে বুঝায় না; যাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা আছে, তাদেরকে বুঝায়। পাঁচ সাত জন লোকেরও একটি জামা'ত হতে পারে, যদি তাদের সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা থাকে। নবুওয়াতের প্রথম দিন মাত্র চার ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তখনও মুসলমানদের একটি জামা'ত ছিল। তিনি ছিলেন এ জামা'তের নেতা এবং পঞ্চম ব্যক্তি। পক্ষান্তরে সংখ্যায় আট দশ হাজার হলেও

মক্কার পৌত্তলিকগণের কোন জামা'ত ছিল না; সমগ্র আরববাসীরও কোন জামা'ত ছিল না। কারণ তাদের সমবেত সিদ্ধান্ত এবং সাধারণ কার্যতালিকা ছিল না।

আহমদীগণ স্বতন্ত্র জামা'ত সৃষ্টি করেছে বলার পূর্বে দেখা আবশ্যক যে, মুসলমানের কোন সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকা আছে কিনা। ভিতরকার বিবাদ-নিষ্পত্তি করতে সক্ষম তাদের কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। আপোষে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যেও বিবাদ বাধিত। বিভিন্ন গোষ্ঠির মুসলমানদের মধ্যেও বিবাদ দেখা দিত। আঁ-হযরত (সা.)-এর হস্তক্ষেপেই এ সকল বিবাদ দূরীভূত হত। তাঁর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের হস্তক্ষেপে এ বিবাদ দূরীভূত হত। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও প্রায় সত্তর বৎসর সমগ্র মুসলমান জাতি একই রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল। এ রাষ্ট্রকে ভাল-মন্দ যাই বলা হোক না কেন, এটা সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে একই ব্যবস্থার অধীনে সংহত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ রাষ্ট্রের অবসানে মুসলিম দুনিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাংশ ছিল স্পেনীয় খলীফাদের অধীনে। আর অপরাংশ ছিল বাগদাদের খলীফাদের অধীনে। এ সময়েও মুসলমানদের সংহতি বা জামা'তের ততটা ক্ষতি হয় নি। তখনও দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান একই ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে সংহত ছিল।

আঁ-হযরত (সা.)-এর তিন শত বছর পরে মুসলিম সংহতি বা জামা'ত ভেঙ্গে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ (اخرجه النسائي ايضاً باب مناقب صحابه)

"আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট, তারপর তার সন্নিহিতগণ, তারপর তার সন্নিহিতগণ, অতঃপর, মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হবে।" (নিসাঈ ও মিশকাত, বাব মুনাকেব সাহাবা)

বস্তুতঃ এরূপই ঘটেছে। আঁ-হযরত (সা.)-এর তিনশ' বছর পরে বিশ্ব মুসলিম সমাজ ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। গত তিনশ' বছরের মধ্যে তাদের পতন চরমে পৌঁছেছে।

মুসলিম জগতের এহেন অবস্থায় সমবেত সিদ্ধান্ত ও সাধারণ কার্যতালিকাসহ কোন ইসলামী জামা'তের উদ্ভব হলে, এ কথা বলা যায় না যে, স্বতন্ত্র জামা'ত গঠন করা হয়েছে। বরং এ কথাই বলা যেতে পারে যে, জামা'ত ছিল না, জামা'ত গঠন করা হয়েছে।

এমন সময়ও ছিল, যখন এক একজন মুসলমান বাদশাহের ভয়ে সমগ্র ইউরোপ কাঁপত। আর এখন সমগ্র মুসলিম জগত ইউরোপ আমেরিকার এক একটি শক্তির ভয়ে কাঁপে। মিসর, ইরাক, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেষ্টাইনের মিলিত মুসলিম শক্তি ক্ষুদ্র ইসরাঈল রাষ্ট্রের সাথে এঁটে উঠতে পারছে না। আমেরিকা ও ইংরেজ ইসরাইলের সাহায্য করছে সত্য কিন্তু এ কথাও তো সত্য যে, সমগ্র ইউরোপ এক একজন মুসলমান বাদশাহকে ভয় করত, আর এখন সমগ্র আরবের সম্মিলিত শক্তি আমেরিকা ও ইংরেজের পরোক্ষ সাহায্যপুষ্ট ইসরাঈলের সাথে পারছে না।

বহু মুসলিম রাষ্ট্র আছে, কিন্তু জামা'ত বা সংহতি বলতে যা বুঝায়, মুসলমানদের তা নেই। খোদার ফযলে শ্রেষ্ঠতম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভব হয়েছে। তবে ইসলাম বা মুসলমান বলতে পাকিস্তান বুঝায় না; আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, আরব, মিশর বা অন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রকেও বুঝায় না। ইসলাম বলতে সারা দুনিয়ার মুসলমানের একতা ও সংহতির বন্ধনকে বুঝায়। মুসলমানদের মধ্যে তা নেই। পাকিস্তান আফগানিস্তানকে ভালবাসে; আফগানিস্তানও পাকিস্তানকে ভালবাসে; কিন্তু তারা পরস্পর পরস্পরের সকল কথা মানতে প্রস্তুত নয়। উভয়ের রাষ্ট্রনীতি পৃথক এবং প্রত্যেকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন। ব্যক্তিগত অবস্থাও এরূপ; প্রত্যেক ইরাকী, ইরানী, মিশরী স্বতন্ত্র। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথে একই সাধারণ পথে পরিচালিত করার মত কোন প্রতিষ্ঠান নেই। ফল কথা, বহু মুসলমান আছে; বহু মুসলমান রাষ্ট্র আছে; তাদের মধ্যে খোদার ফযলে অনেক রাষ্ট্র মজবুতও হচ্ছে। কিন্তু মুসলিম সংহতি বা জামা'ত নেই।

মনে করুন, পাকিস্তানের নৌবহর ভারত মহাসাগরে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছে, পাকিস্তানের সামরিক শক্তির ভয়ে ভারত ইউনিয়ন কাঁপছে, পৃথিবীর সমস্ত অর্থ-কেন্দ্র পাকিস্তানের করতলগত হয়েছে, পাকিস্তানের প্রভাব আমেরিকা হতেও বেশী হয়েছে; ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, এবং মিশর প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানের সাথে একত্রীভূত হতে প্রস্তুত হবে কি? নিশ্চয় না। তারা পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতে প্রস্তুত হবে; তার সাথে সহানুভূতি দেখাতে প্রস্তুত হবে, কিন্তু তার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন করতে প্রস্তুত হবে না।

খোদার ফযলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো উন্নতি করেছে। নতুন নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভবও হচ্ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুনিয়ার সকল মুসলমানকে নিয়ে এক ইসলামী জামা'ত নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বতন্ত্র রাজনীতির অনুসরণ করেছে এবং

তারা পৃথক পৃথক রাজ্যে বিভক্ত। তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কোন শক্তি নেই।

আরবের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। সিরিয়ার মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। ইরানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। আফগানিস্তানের মুসলমানদের নাম ইসলাম নয়। যখন দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমান কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে ইসলামের নামে একত্রিত হয়, তখন তাকেই ইসলামী জামা'ত বলা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে এরূপ জামা'ত কায়েম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রাজ্য বা রাষ্ট্র থাকলেও, আমরা এটা বলতে বাধ্য যে, মুসলমানদের কোন জামা'ত নেই।

মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সংহতি নেই, একথা যেমন সত্য, দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একতাবদ্ধ করার জন্য তাদের কোন সর্বজনগৃহীত কর্মসূচী নেই একথাও তেমনি সত্য। ব্যক্তিগতভাবে কোথাও মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের কোন এক শত্রুর মোকাবেলা করা এক কথা; আর এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে সমবেতভাবে ইসলামের সমুদয় শত্রুর প্রতিরোধ করা অন্য কথা। সুতরাং, কর্মসূচীর দিক হতে বিচার করলেও দেখা যায় যে, মুসলমানদের কোন জামা'ত নেই।

এরূপ অবস্থায় যদি কোন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উল্লিখিত দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে যদি তারা দন্ডায়মান হয়, তাহলে এরূপ আপত্তি করা যাবে না যে, একটি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরং বলতে হবে যে, কোন জামা'ত ছিল না, এখন এক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা সন্দেহ করেন যে, এক নামায, এক কেবলা, এক কুরআন এবং এক রসূল হওয়া সত্ত্বেও আহমদীগণ পৃথক জামা'ত কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করল? তাদেরকে আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে বলি যে, ইসলামের এখন এক জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসে গেছে। এ কাজের জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করা যাবে? মিশর নিজের জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে, ইরান নিজের জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে, আফগানিস্তান নিজের জায়গায় কাজ করে যাচ্ছে। অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ জায়গায় নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এদের উপস্থিতি সত্ত্বেও একটি বিরাট ফাঁক ও অভাব রয়ে যাচ্ছে। এ ফাঁক ও অভাব পূরণ করার জন্য আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখন তুর্কিগণ তুরস্কের খেলাফতের অবসান করে দিল, তখন মিশরের আলেম সমাজের একদল মিশরের বাদশাহকে খলীফা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন (কোন গোপন সূত্রে প্রকাশিত হয় যে, এ আন্দোলন মিশরের

বাদশাহ্‌র ইঙ্গিতেই হয়েছিল)। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মিশরের বাদশাহকে খলীফাতুল মুসলেমীন পদে প্রতিষ্ঠিত করা। এতদ্বারা অপরাপর ইসলামী রাষ্ট্রের উপর মিশরের এক মর্যাদা লাভ হবে। সৌদি আরব তার বিরোধিতা করে প্রচার করল যে, এ আন্দোলন ইংরেজদের ইঙ্গিতে হচ্ছে। মুসলিম দুনিয়ার খলীফা হবার অধিকার কারো থাকলে, সে অধিকার আরবের বাদশাহ্‌র সর্বাধিক। খেলাফত এমন এক প্রতিষ্ঠান যে, এর দ্বারা সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়ে যায়। কিন্তু তখন অপরাপর বাদশাহ্‌গণ সাথে সাথে প্রমাদ গুনতে থাকে যে, তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বুঝি বাম হস্তক্ষেপ হয়ে যায়। এ জন্যই এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ আন্দোলন যখন জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং এর পিছনে ধর্মের প্রেরণা কাজ করে তখন কোন রাষ্ট্রীয় বাধা তার পথ রোধ করতে পারে না। একমাত্র জামা'তী বাধাই তার পথ রোধ করতে পারে।

কোন দেশের রাষ্ট্রপতি খেলাফতের দাবি করলে, অন্যান্য রাষ্ট্রে বিরোধিতার ফলে খেলাফতের আন্দোলন উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। কিন্তু জামা'তের বিরোধিতা হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন কোন দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রত্যেক দেশেই এটা পৌঁছবে, এটা প্রসার লাভ করবে এবংং শিকড় গেঁড়ে বসবে; এমনকি যেসব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র নেই সেখানেও এটা সাফল্য লাভ করবে। কারণ কোন রাষ্ট্রীয় বাধা না থাকার ফলে প্রথম প্রথম কোন রাষ্ট্রই এর বিরোধিতা করবে না। আহমদীয়াতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য। আহমদীয়াতের উদ্দেশ্য মুসলমানদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠিত করা। প্রভুত্ব লাভ করা এটার উদ্দেশ্য নয়। ইংরেজগণ নিজেদের সাম্রাজ্যে সময়ে সময়ে আহমদীদেরকে বিড়ম্বনা দিয়েছে সত্য; কিন্তু যেহেতু এটা নিছক ধর্মীয় আন্দোলন সেজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কখনও সরকারীভাবে এটাকে বাধা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি। মোল্লাদের চাপে আফগান সরকার সময় সময় আহমদীদের উপর অত্যাচার করেছে সত্য; কিন্তু আফগান বাদশাহগণ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং অনুতাপও করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জনসাধারণ, উলেমা, এবং তাদের ভয়ে ভীত হয়ে সরকারপক্ষ, কোন কোন সময়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোন সরকার এ চিন্তা করে নি যে, এ আন্দোলন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে উৎখাত করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। তাদের এরূপ চিন্তা না করা ঠিক ছিল। রাজনীতি করা আহমদীদের উদ্দেশ্য নয়। আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থার সংস্কার করা, এবং তাকে একসূত্রে বেঁধে দেয়া যেন তারা সম্মিলিতভাবে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্ত্রের দ্বারা মোকাবেলা করতে পারে। এ উদ্দেশ্য

নিয়ে আহমদী প্রচারকগণ আমেরিকা যায়। এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে সে দেশে যতটা বিরোধিতা রয়েছে, তার অতিরিক্ত কিছু আমেরিকাবাসীরা আহমদী প্রচারকদের বিরুদ্ধে করে নি। ধর্মীয় আন্দোলনের প্রশ্নে তারা মোটেই কোন বিরোধিতা করে নি। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সরকারও এ নীতিই গ্রহণ করেছিল।* যখন তারা দেখল যে, রাজনীতির ব্যাপারে আহমদীরা নাক গলায় না, তখন তারা আহমদীদের সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ নিতে থাকে এবং তাদেরকে অবহেলার চোখে দেখতে থাকে। কিন্তু সরকারীভাবে তাদের বিরোধিতা করার কোন প্রয়োজনই অনুভব করে নি। তাদের দিক দিয়ে এ ব্যবহার ন্যায্য ছিল। আমরা তাদের রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষভাবে দখল না দেয়ায়, তারা সরকারীভাবে আমাদের বিরুদ্ধাচারণ করে নি। তার ফলে আজ প্রায় সকল দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ মহাদেশ, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক দেশেই ছোট বড় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। এমন না যে, সেখানে কতক এতদ্দেশীয়রা আহমদী হয়ে গেছে। সেখানকার এমন নিষ্ঠাবান অধিবাসীরা আহমদী হয়েছে যারা ইসলামের সেবার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

জনৈক ইংরেজ লেফটেন্যান্ট নিজ জীবন উৎসর্গ করে মোবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যাণ্ডে কাজ করছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন এবং মদ স্পর্শ করেন না। নিজ শ্রমে অর্জিত পয়সা দ্বারা তিনি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করেন ও সভা সমিতি করে থাকেন। তাকে আমরা যে ভাতা দিয়ে থাকি, ইংল্যাণ্ডের বহু দিন-মজুরও তদাপেক্ষা অধিক পয়সা রোজগার করে থাকে।

অনুরূপভাবে জনৈক জার্মান সামরিক অফিসারও নিজ জীবন ওয়াক্‌ফ করেছেন। বহু চেষ্টার পর তিনি জার্মানী হতে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন। তার সুইজারল্যাণ্ডে পৌঁছার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে এবং সেখানে তিনি ভিসার অপেক্ষায় আছেন। তিনি ইসলামের সেবা করার অপরিসীম উদ্যম অন্তরে পোষণ করেন এবং এজন্য তিনি পাকিস্তানে আসছেন।* এখানে এসে ইসলামের পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করবেন। জার্মানবাসী অপর একজন যুব-লেখক এবং তার বিদুষী স্ত্রীও নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছেন। খুব সম্ভব তারা অতি সত্বরই এ বিষয়ে মীমাংসা করে ইসলামী শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে আসবেন।

* এ পুস্তিকা যখন লেখা হয় তখন ডাচগণ (ওলন্দাজ) ইন্দোনেশিয়ার শাসক ছিল।

* তিনি পাকিস্তানস্থ রাবওয়ায় এসে শিক্ষা সমাপন করে বর্তমানে আমেরিকায় মোবাল্লেগ পদে নিযুক্ত আছেন।

হল্যাণ্ডের একজন যুবকও ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছেন এবং তিনি সম্ভবত: শীঘ্রই কোন এক দেশে প্রচারকের কাজে লেগে যাবেন।

জামা'তে আহমদীয়া একটি ক্ষুদ্র জামা'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবেচনা করতে হবে যে, এ ক্ষুদ্র জামা'ত দ্বারাই ইসলামী জামা'ত কায়েম হতে চলেছে।

প্রত্যেক দেশে কিছু সংখ্যক লোক এটার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক বিশ্ব মিলনের ভিত্তি স্থাপন করছে। সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদীর মধ্য হতেই কিছু কিছু লোক এটাতে এসে শামিল হচ্ছে।

এ সমস্ত আন্দোলনের সূচনা ক্ষুদ্রাকারেই হয়ে থাকে, কিন্তু সময়ে এটা ত্বড়িত শক্তি সঞ্চয় করে অল্প সময়ের মধ্যে একতা এবং মিলনের বীজ বপনে কৃতকার্য হয়ে যায়। যেমন রাজনৈতিক শক্তি লাভের জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় শক্তি লাভের জন্য দরকার হয় নৈতিক, ধর্মীয় দল গঠনের। এ কারণেই জামা'তে আহমদীয়া রাজনীতি হতে দূরে থাকে, কারণ ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে পরিণামে তারা নিজ কাজে অলস হয়ে পড়বে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রোগ্রাম

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল প্রোগ্রামের: এখন ইসলামে, কেবলমাত্র জামা'তে আহমদীয়ারই সম্মিলিত প্রোগ্রাম আছে এবং অন্য কোন সংগঠনের সম্মিলিত প্রোগাম নেই।

খ্রিষ্টীয় ধর্মের আক্রমণের সঠিক রূপ ও গুরুত্ব নির্ণয় করে প্রত্যেক দেশে জামা'তে আহমদীয়া তার সাথে শক্তি পরীক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ এবং এক হিসেবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ হচ্ছে আফ্রিকা। খ্রিষ্টানগণ তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আফ্রিকায় অভিযান চালিয়েছে এবং প্রকাশ্যভাবে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করছে। ইতোপূর্বে কেবল পাদ্রীদের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীলদের দৃষ্টি এ দিকে পড়ছে এবং শ্রমিক পার্টিও ঘোষণা করছে যে, ইউরোপের মুক্তি, আফ্রিকার উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আফ্রিকার উন্নতি ও অগ্রগতি

ইউরোপের পক্ষে উপকারী বলতে ইউরোপ মনে করত সমস্ত আফ্রিকাবাসীকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা। ২৪ বছর পূর্বে আহমদীয়া জামা'ত খ্রিষ্টানদের এ দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নিজেদের মোবাল্লেগ পাঠিয়ে দেয়। ফলে হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী খ্রিষ্ট ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমানে আফ্রিকায় সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খল ইসলামী জামা'ত হচ্ছে আহমদীয়াতের। আহমদীয়া জামা'তের সঙ্গে মোকাবেলা করতে খ্রিষ্টানগণ এখন ইতস্তত: করতে আরম্ভ করছে। তাদের সকল পত্রিকায় এ কথা প্রকাশিত হচ্ছে যে, আহমদীয়া জামা'ত তাদের সকল পরিশ্রম পণ্ড করে দিয়েছে। পূর্ব আফ্রিকাতেও এ তবলীগের কাজ মাত্র কয়েক বছর যাবত চলে আসছে। সেখানে এখনও কাজের সূচনা মাত্র। সেজন্য সেখানে পশ্চিম আফ্রিকার ন্যায় উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ সম্ভব হয় নি। অবশ্য, সেখানেও অনেক খ্রিষ্টান ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করছে। আশা করা যায় যে, মোবাল্লেগদের চেষ্টায় খোদা চান তো কয়েক বছরের মধ্যেই আরও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে। বর্তমানে সেখানে কাজে দ্রুত উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াতেও আমাদের মিশন স্থাপিত হয়েছে এবং ইসলামের দলত্যাগীদেরকে ফিরিয়ে এনে একত্রিত করে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য খাড়া করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

খ্রিষ্টান শক্তিসমূহের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী। বিগত ২৪ বছর যাবত সেখানেও আহমদী মোবাল্লেগগণ কাজ করছে ফলে হাজার হাজার আমেরিকাবাসী আহমদীয়াতে দাখেল হয়েছে এবং ইসলামের সাহায্যের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার ডলার ব্যয় করছে। আমেরিকার ঐশ্বর্যের তুলনায় এটা কিছুই নয় এবং তথাকার পাদ্রীদের চেষ্টার তুলনায় আমাদের কর্মতৎপরতা অতি নগণ্য। কিন্তু বক্তব্য এই যে, আমরা সেখানে মোকাবেলা আরম্ভ করে দিয়েছি এবং সাফল্য আমাদেরই হচ্ছে। কারণ খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হতে লোকদিগকে আমাদের জামা'তে আনছি। খ্রিষ্টানগণ আমাদের জামা'ত হতে কাউকেও তাদের দলভুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

অতএব, একথা বলা সমীচীন হবে না যে, আহমদীগণ নতুন জামা'ত কেন স্থাপন করল, বরং বলা উচিত যে, আহমদীগণ একটা জামা'ত স্থাপন করেছে, যা ইতোপূর্বে ছিল না। এটা আপত্তি করার বিষয়, নাকি প্রশংসনীয় বিষয়?

আহমদীগণকে অপর সকল হতে পৃথক রাখার কারণ

অনেকেই বলে থাকেন যে, পৃথক জামা'ত গঠনের কি প্রয়োজন ছিল। শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করলেই চলত। এ প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর হচ্ছে যে, একজন কমাণ্ডার ঐ সব লোককেই যুদ্ধে যেতে আদেশ করতে পারেন, যারা যথারীতি সৈনিকের দলে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু যারা সৈনিকের দলে ভর্তি হয় নি তাদেরকে কেমন করে তিনি যুদ্ধে যাবার আদেশ দিতে পারেন? যদি কোন জামা'ত গঠন না করা হতো তাহলে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কার দ্বারা কাজ নিতেন? তিনি কাকে আদেশ দিতেন এবং তার খলীফাগণই বা কার দ্বারা কাজ করাতেন বা কাকে আদেশ করতেন? তিনি কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন এবং মুসলমানদেরকে ধরে ধরে বলতেন যে, ইসলামের জন্য আজ তোমার অমুক দেশে যাবার প্রয়োজন আছে, তুমি সেখানে যাও এবং উত্তরে বলত যে, আমি আপনার কথা মানতে বাধ্য নই, পরে তিনি অপর একজনকে গিয়ে বলতেন, তারপর এরূপ আর একজনকে গিয়ে ধরতেন এবং প্রত্যেকেই অস্বীকার করত?

যুক্তির কথা হচ্ছে, স্থায়ী এবং সুসংঘবদ্ধভাবে কোন কাজ করতে হলে জামা'ত থাকার একান্ত প্রয়োজন আছে। জামা'ত ব্যতীত কোন মহান কাজ সুষ্ঠুরূপে সমাধা হতে পারে না।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, জামা'ত গঠন করার পরও তো সকলে মিলে মিশে থাকতে পারি। উত্তরে বলব যে, এক পাগল ছাড়া অন্য কেউ জেনে শুনে বাঘের মুখে হাত দিতে রাজী হবে না। কাজেই এহেন পাগলদেরকে বিচক্ষণ লোক হতে পৃথক করে রাখা একান্ত প্রয়োজন; কারণ যদি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এ পাগলদেরকে নিজেদের মত করে গড়ে তোলে, তবে এ সমস্ত পাগলামীর কাজ কে করবে? অপর সব হতে পৃথক থাকার ফলে তাদের চরিত্রের মধ্যে আপনা আপনি এক বিশেষত্ব ফুঁটে উঠে যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অপর সকলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দেয়। যাকে তারা নিশ্চিহ্ন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, পরিণামে একদিন নিজেরাই তার শিকার হয়ে যায়। মোট কথা, আপত্তির কারণ হল বিষয়টি তলিয়ে না দেখা।

বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে তারা বুঝতে পারত যে, আহমদীগণ যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা সঠিক এবং নির্ভুল; এ সঠিক পন্থা অবলম্বন করেই আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের জন্য জীবন-উৎসর্গকারীদের একটা দল গঠন

করেছে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা এ নিয়মে চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রত্যহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। শেষে কাফেররা মনে করবে যে, ইসলাম এখন শক্তিশালী হয়ে পড়েছে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তারা ইসলামের উপর আক্রমণ করবে। কিন্তু তখন দেখা যাবে তাদের সময় গত হয়ে গেছে। ইসলামের বিজয় হবে। কুফর পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আমরা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করি না। বরং তাদেরকে এটাই বলি যে, যে পর্যন্ত আমাদের বক্তব্য তারা অনুধাবন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজ কর্তব্য করে যাক এবং আমাদের কাজে তারা বাধা সৃষ্টি না করুক। যে তাদের কাজ ভাল মনে করে, সে তাদের সঙ্গে যোগদান করুক এবং যে আমাদের কাজকে ভাল মনে করে সে আমাদের সঙ্গে যোগদান করুক। তাদের পথে আত্মত্যাগ অল্প এবং প্রচারণা বেশী এবং আমাদের পথে ত্যাগ অধিক, প্রচারণা অল্প। তারা তাদের কাজের ফল পাবে এবং আমরা আমাদের কাজের ফল পাব। ইসলামের প্রতিষ্ঠা যাদের কাম্য, তারা আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবে এবং যারা পার্থিব রাজত্বের জন্য লালায়িত তারা ঐ দলে গিয়ে মিলিত হবে। হয়তো ব্যথা বিভিন্ন অঙ্গে। তাদের বেদনা শিরে এবং আমাদের বেদনা অন্তরে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উত্তর দিয়ে আসছি। এখন আমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উত্তর দেব।

এটা আল্লাহ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম যে, যখনই পৃথিবীতে অন্যায় বৃদ্ধি পায় তখনই পৃথিবী হতে আধ্যাত্মিকতা লোপ পায়। মানুষ অধর্মকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করে। তখন আল্লাহ তা'লা মানবের হেদায়াত ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য কোন মনোনীত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন, যিনি পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথে ফিরিয়ে আনেন এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত ধর্মকে পুনরায় পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন সময় এই প্রেরিত মহাপুরুষগণ ধর্ম-বিধান আনয়ন করেন, আবার কোন কোন সময় পূর্ববর্তী শরীয়তকে পুনঃ স্থাপন করেন। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'লার এ সনাতন নিয়মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং আল্লাহ তা'লার এ অনুগ্রহ ও অনুকম্পার নিদর্শনের প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করেছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'লা অসীম ক্ষমতার অধিকারী এবং মানুষ তার তুলনায় কীটানুকীট হতেও অধম। এটাও সত্য যে, আল্লাহ তা'লার

প্রত্যেকটি কাজই প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি কোন কাজ বিনা কারণে এবং উপকারবিহীনভাবে করেন না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ (سورة دخان)

অর্থাৎ– আমরা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী অহেতুক সৃষ্টি করি নি, বরং এটার সৃষ্টিতে কোন উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মানব নিজের মধ্যে আল্লাহ তা'লার মহিমার বিকাশ ঘটাবে এবং তার প্রকাশক হয়ে, পৃথিবীর যে সমস্ত লোক উচ্চস্তরের চিন্তা করতে পারে না, তাদেরকে আল্লাহ তা'লার পরিচয় দান করবে (সূরা দুখান : ৩৯-৪০)।

সৃষ্টির আদি হতে আল্লাহ তা'লার এ বিধান চলে আসছে। বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'লা তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। কোন সময় আদম (আ.)-এর মাধ্যমে তার মহিমার বিকাশ হয়েছে, কখনো নূহ (আ.)-এর মারফত, কখনো ইবরাহীমি কায়াতে, আবার কোন সময় তা মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কখনো দাউদ (আ.) খোদা তা'লার জ্যোতি: পৃথিবীকে দেখিয়েছেন এবং কখনো মসীহ্ (আ.) খোদার আলো নিজ দেহে বিকাশ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ এবং পূর্ণাকারে আল্লাহ তা'লার সব গুণরাজী একত্রিত ও বিস্তারিতভাবে এবং একক ও সমষ্টিগতরূপে বিশ্বে এমন প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সাথে প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ববর্তী সব নবী তার সূর্যবৎ অস্তিত্বের সম্মুখে নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছেন।

রসূলে করীম (সা.)-এর আগমনে সব শরীয়তের সমাপ্তি ঘটেছে এবং সর্বপ্রকার শরীয়ত আনয়নকারী নবীদের আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এটা কোন পক্ষপাতিত্ব নয় বা কারও সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নতুন শরীয়তের আগমন এ জন্য বন্ধ হয়েছে, যেহেতু, আঁ-হযরত (সা.) এমন এক শরীয়ত এনেছেন, যা শরীয়তের সব অভাব ও আবশ্যকতাকে পূর্ণ করছে। খোদা তা'লার নিকট হতে যা কিছু আসার ছিল তা পরিপূর্ণরূপে এসে গেছে। কিন্তু মানুষের জন্য এমন কোন নিশ্চয়তা দান করা হয় নি যে, তারা পথভ্রষ্ট হবে না এবং সত্য শিক্ষাকে ভুলে যাবে না। বরং পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা স্পষ্টরূপে বলেছেন :

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ - (سورة سجدة)

অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ সর্বশেষ কালাম (বাণী) এবং নিজ সর্বশেষ শরীয়তকে আকাশ হতে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন এবং মানুষের বিরোধিতা এর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না; কিন্তু পুনরায় কিছু কাল পরে এ কালাম আকাশে উঠতে থাকবে এবং এক হাজার বছরে এটা পৃথিবী হতে উঠে যাবে (সূরা সিজ্‌দা : ৬ আয়াত)।

আঁ-হযরত (সা.) ধর্মের প্রতিষ্ঠার সময়কে তিনশ' বছর বলে নির্ধারিত করেছেন। ইতোপূর্বে হাদীসে এটার বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনও এর الٓمٓرٰ দ্বারা অর্থাৎ আরবী বর্ণমালার আবজাদ মান অনুযায়ী এ যুগকে দু'শ একাত্তর (২৭১) বছর বলে নির্দিষ্ট করেছেন এবং এটার সাথে ধর্মের আকাশে উত্থানের ১০০০ বছর সময় যোগ করলে ১২৭১ হয়। অতএব, দুনিয়া হতে ইসলামের অন্তর্ধানের সময় কুরআন দৃষ্টে ১২৭১ বছর হয়। এ হিসেবে নির্দিষ্ট সময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পড়ে। পবিত্র কুরআনের নিয়মানুয়ায়ী ঠিক এমনি সন্ধিক্ষণে খোদার তরফ হতে নিশ্চয় কোন হাদী বা পথ-প্রদর্শক এসে থাকেন, যেন পৃথিবী চিরকালের জন্য শয়তানের দখলে চলে না যায় এবং খোদা তা'লার রাজত্ব চিরকালের জন্য পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হয়ে না যায়। সুতরাং এ সময়ে খোদা তা'লার তরফ হতে পৃথিবীতে কোন প্রেরিত পুরুষের আগমনের প্রয়োজন ছিল। আগমনকারী যিনিই হোন না কেন উপরোক্ত সময়ে একজন আসার প্রয়োজন।

আদম (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদা তা'লা তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। নূহ্ (আ.)-এর অনুগামীদের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, খোদা তা'লা তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে যখন গ্লানি দেখা দিল, খোদা তা'লা তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। যখন হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদা তা'লা তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিল, তখন খোদা তা'লা তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। অতএব, এটা কিরূপে সম্ভব যে, নবীকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে গ্লানি দেখা দিলে তিনি তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা করবেন না? আঁ-হযরত (সা.)-এর উম্মতের জন্য তো ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লানি দূর করার জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদ আগমন করবেন।

যেমন রসূলে করীম (সা.) বলেছেন:

إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

(ابوداؤد ج۲ صفحه ۲٤١)

অর্থাৎ– নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন, যিনি তাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন (আবু দাউদ ও মিশকাত)।

সুতরাং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি কিরূপে এটা মানতে পারেন যে, ক্ষুদ্রাকারের গ্লানি দূর করার জন্য তো আল্লাহর তরফ হতে মুজাদ্দিদ আগমন করবেন, কিন্তু তাদের ভীষণ বিপদের সময় কোন মনোনীত ব্যক্তি আসবেন না, কোন হাদী আসবেন না এবং কোন পথ প্রদর্শক আসবেন না, মুসলমানদেরকে সত্য ধর্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ও একত্রিত করার জন্য খোদা তা'লার তরফ হতে কোন আহ্বান আসবে না, তাদেরকে পাপের অন্ধকার আবর্ত হতে তোলার জন্য আকাশ হতে কোন রজ্জু নামিয়ে দেয়া হবে না? অথচ আঁ-হযরত (সা.) এ বিপদ সম্পর্কে বলেছেন: "যখন হতে পৃথিবীতে নবীগণের সমাগম আরম্ভ হয়েছে, তখন হতে তাঁরা সকলেই এ বিপদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী করে আসছেন।" যে খোদা সৃষ্টির আদি হতে দয়া ও অনুকম্পার নমুনা দেখিয়ে আসছেন, নবী করীম (সা.)-এর আবির্ভাবে তাঁর সে দয়া ও অনুকম্পা সমুদ্রাকারে উদ্বেলিত হয়েছে, নাকি তা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে?

খোদা তা'লা কখনো যদি রহীম ছিলেন, তাহলে মুহাম্মদী উম্মতের জন্য তাঁর আরও বেশী রহীম হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন সময় তিনি করীম ছিলেন, তবে মুহম্মাদী উম্মতের জন্য এখন তাঁর আরও অধিক করীম হওয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এরূপই। পবিত্র কুরআন এবং হাদীস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মধ্যে যখনই গ্লানি আসবে, খোদা তা'লা নিজের তরফ হতে হাদী এবং পথ-প্রদর্শক পাঠাতে থাকবেন, বিশেষ করে শেষ যুগে যখন দাজ্জালের ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে, খ্রিষ্টধর্ম প্রবল হবে, ইসলাম বাহ্যতঃ পরাভূত হবে এবং মুসলমানগণ ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিবে এবং অন্যান্য জাতির চাল-চলন গ্রহণ করবে, তখন রসূলে করীম (সা.)-এর একজন মাযহার (পূর্ণ প্রকাশক) আবির্ভূত হবেন এবং তিনি ঐ যুগের সংস্কার করবেন। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا يَبْقٰى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهٗ وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ إِلَّا رَسْمُهٗ ★

(مشكوٰة كتاب العلم)

অর্থাৎ– ইসলামের শুধু নাম অবশিষ্ট থাকবে এবং কুরআনের শুধু লেখা থেকে যাবে। ইসলামের সারবস্তুর কোথাও খোঁজ পাওয়া যাবে না এবং কুরআনের অর্থ কারও মর্মস্পর্শ করবে না (বায়হাকী, মিশকাত কিতাবুল ইলম)।

অতএব, হে প্রিয় বন্ধুগণ! আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠা সে চিরন্তন নিয়মানুযায়ীই হয়েছে। এ সময়ের সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সা.) এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই ঘটেছে।

যদি মির্যা সাহেবের মনোনয়ন ঠিক না হয়ে থাকে, তবে সে অভিযোগ খোদা তা'লার বিরুদ্ধে, মির্যা সাহেবের এতে কি অপরাধ? সব অজানা যদি খোদা তা'লার জানা থাকে, কোন রহস্যই যদি তাঁর নিকট গোপন না থাকে এবং যদি তিনি প্রজ্ঞাময় হয়ে থাকেন, তবে বুঝতে হবে যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মনোনয়ন নির্ভুল হয়েছে এবং তাঁকে গ্রহণ করাতেই মুসলমান তথা বিশ্বের মঙ্গল। তিনি নতুন কোন সংবাদ আনয়ন করেন নি। পরন্তু তিনি সে সংবাদ এনেছেন, যা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুনিয়াবাসীকে শুনিয়েছিলেন, কিন্তু দুনিয়াবাসী তা ভুলে গিয়েছে। এটা সে সংবাদ যা পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছিল, কিন্তু মানব তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে চিরন্তন সংবাদ এটাই যে, সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয় খোদা যিনি প্রেম-ভালবাসার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজ গুণাবলী প্রকাশ করার জন্য মানব সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً *
(سورة بقره)

অর্থাৎ– এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে চলেছি' (সূরা বাকারা ঃ ৩১ আয়াত)।

অতএব, আদম (আ.) এবং তাঁর বংশধরগণ খোদা তা'লার খলীফা বা প্রতিনিধি। খোদা তা'লার গুণরাজিকে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সমগ্র মানবজাতির কর্তব্য হচ্ছে, নিজ জীবনকে খোদা তা'লার গুণে গুণান্বিত করে তোলা। একজন উকিল যেমন প্রতি কাজে নিজ মক্কেলের প্রতি মনোযোগী হয়, একজন দাঁস যেমন প্রতি পদক্ষেপে প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে খোদা তা'লার সাথে এমন সম্বন্ধ স্থাপন করা যাতে খোদা তা'লা তার প্রতি কাজে প্রতি মুহূর্তে তাকে পথ প্রদর্শন করেন এবং

তিনি যেন তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হন এবং সে যেন প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়। এ কর্তব্য সাধন করার জন্যই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর কাজ সংসারাসক্ত জনগণকে ধার্মিক করা, ইসলামের অনুশাসনকে মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পুনরায় তাঁর আধ্যাত্মিক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা, যে সিংহাসন হতে তাঁকে নামানোর জন্য শয়তানী শক্তিসমূহ ভিতরে এবং বাইরে চেষ্টা করছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব প্রথম মুসলমানদের মনোযোগ খোলসের পরিবর্তে সার পদার্থের দিকে আকর্ষণ করলেন। তিনি জানালেন যে, আদর্শের বাহ্যিক দিকটাও পালন করা অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগী না হলে কেবল বাহ্যিক আদেশ পালন করে মানুষ উন্নতি লাভ করতে পারে না। তদনুযায়ী তিনি এক জামা'ত স্থাপন করলেন এবং বয়আত নামায় এ শর্ত রাখলেন যে, 'আমি ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিব।'

প্রকৃত পক্ষে পার্থিবতার ব্যাধিই মুসলমানদেরকে ঘুণের মত খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। দুনিয়া তাদের হাত ছাড়া হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর দিকেই তাদের নজর ছিল। ইসলামের উন্নতির অর্থে তারা রাজত্ব লাভ করা মনে করত এবং ইসলামের সফলতার অর্থে তারা তথাকথিত মুসলমানগণের শিক্ষা এবং বাণিজ্যিক উন্নতি মনে করত। অথচ রসূলে করীম (সা.) পৃথিবীতে এ জন্য আসেন নি যে, মানুষ নিজেদেরকে কেবল মুসলমান বলবে। বরং তিনি এসেছিলেন সকলকে সেরূপ খাঁটি মুসলমান বানাতে যেরূপ মুসলমানের ব্যাখ্যা পবিত্র কুরআনে এসেছে:

مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ *

অর্থাৎ– যে নিজের সত্তাকে খোদা তা'লার জন্য উৎসর্গ করে দেয় এবং নিজ পার্থিব প্রয়োজনকে ধর্মীয় প্রয়োজনের অধীনে রাখে (সূরা বাকারা : ১১৩ আয়াত)।

বাহ্যতঃ এটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, ইসলাম কখনও একথা বলে না যে, তুমি বিদ্যা শিক্ষা করো না বা কোন কলা কৌশল শিখো না, এটা একথাও বলে না যে, তুমি নিজ রাজ্যকে শক্তিশালী করো না। ইসলাম মানুষের শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে। পৃথিবীর যাবতীয় কাজের দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি আছে,

প্রথম, খোসার দ্বারা শাঁস লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি আর দ্বিতীয়, শাঁস দিয়ে খোসা লাভ করার দৃষ্টিভঙ্গি। যে ব্যক্তি খোসা লাভ করতে চায়, তার শাঁস পাবার কোন নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশ সময় সে বিফল হয়। কিন্তু যে শাঁস লাভ করে, সে শাঁসসহ খোসাও পেয়ে থাকে। রসূলে করীম (সা.) এবং তাঁর অনুগামীদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ছিল ধর্মের জন্য; কিন্তু সেজন্য তাঁরা পার্থিব বিষয় হতে বঞ্চিত হন নি। এটা স্বাভাবিক কথা যে, যারা ধর্মের বিষয়ে সফলতা লাভ করবে, দুনিয়া কৃতদাসীর ন্যায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আসবে। কিন্তু পার্থিব সফলতার মাধ্যমে পারলৌকিক সফলতা লাভের সম্ভাবনা কম। অধিকাংশ সময় এটা তো হয়ই না, বরং ধর্মের সামান্য যা কিছু থাকে, তাও হারাতে হয়। সুতরাং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণে, খোদার নির্দেশ অনুযায়ী, ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দান করতে লাগলেন। তাঁর আবির্ভাবে মুসলমানদের মধ্যে দু'প্রকারের আন্দোলন চলতে লাগল। প্রথম আন্দোলন ছিল: মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, সুতরাং তাদের পার্থিব শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আন্দোলন ছিল: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রবর্তিত। তিনি বললেন যে, আমাদেরকে ধর্মের দিকে মনযোগী হতে হবে। এটার নিশ্চিত পরিণাম হবে যে, খোদা তা'লা নিজ হতেই আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ দান করবেন।

এতে অনেকেই ভুল বুঝলেন যে, তাঁর আন্দোলন হয়তো আজকালের সুফীগণের ন্যায়, যারা বাহ্যিকভাবে রোযা নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সুস্থ, সক্ষম লোকদেরকে পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের ন্যায় নির্জনবাসে বসিয়ে দেয়। এরূপ হলে তার আন্দোলনও শাঁসের নামে খোসার জন্য হত; কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি যেখানেই ধর্মের প্রতি জোর দিয়েছেন, সেখানে তিনি এ কথার উপরও জোর দিয়েছেন যে, মানবের মেধাকে উদ্দীপ্ত, মস্তিষ্ককে আলোকিত এবং বুদ্ধিকে তীক্ষ্ম করার জন্যই ধর্মের আগমন হয়ে থাকে। তিনি আরও বলেছেন যে, সততার সাথে যে ধর্মকে পালন করে এবং কৃত্রিমতাকে পরিহার করে চলে, ধর্ম তার মধ্যে মহান চরিত্রের সৃষ্টি করে, কর্মশক্তি দেয় এবং আত্মত্যাগ ও পরোপকারের প্রেরণা যোগায়। তিনি আরও বলেছেন, তুমি ধর্মকে গ্রহণ কর, নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দান কর; কিন্তু সে নামায পড় যা কুরআন বলে এবং সে রোযা রাখ যা কুরআন শিক্ষা দেয় এবং সে হজ্জ পালন কর ও সে যাকাত দাও যা কুরআন বলে। কুরআন করীম তোমাকে নিছক ওঠা বসা করতে বলে না, অনর্থক অনাহারে থাকতে বলে না, মিছেমিছি নিজ দেশ ত্যাগ করতে বলে না এবং নিজ ধন-দৌলত নষ্ট করতে বলে না। পবিত্র কুরআনে নামায সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেছেন:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ– নামায তোমাকে অশ্লীলতা এবং বিশ্বাসহীনতা হতে মুক্ত করে। সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি তুমি ঐ দোষ হতে মুক্ত না হও, যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, তবে তোমার নামায প্রকৃত নয় (সূরা আনকবুত: ৪৬ আয়াত)।

রোযা সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ– রোযার বিধান এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, রোযা রেখে যেন তোমার মধ্যে নিষ্ঠা ও উত্তম চরিত্র জন্মে (সূরা বাকারা : ১৮৪ আয়াত)। সুতরাং তুমি রোযা রেখে যদি এ ফল না পাও, তবে বুঝতে হবে যে, তোমার উদ্দেশ্য সৎ নয়, তুমি রোযা রাখ নি, শুধু অনাহারে ছিলে এবং তোমার অনাহারে থাকা আল্লাহ তা'লার অভিপ্রেত ছিল না। হজ্জ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, এটি দেশদ্রোহিতার মনোভাব এবং আত্মকলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদকে বিদূরিত করে। অতএব, হজ্জের বিধান আত্মকলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তিকে দূর করার জন্য। যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ তা'লা বলেছেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا ۔

অর্থাৎ–যাকাত ব্যক্তি ও জাতিকে সংশোধিত করে এবং অন্তর ও চিন্তাকে পবিত্র করে (সূরা তওবা: ১০৩ আয়াত)।

সুতরাং যে পর্যন্ত এসব ফল না পাওয়া যায়, সে পর্যন্ত তোমার হজ্জ এবং যাকাত লোক দেখানো বস্তু। সুতরাং তুমি নামায পড়, রোযা রাখ, হজ্জ কর, যাকাত দাও; কিন্তু আমি তোমার নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতকে তখনই মেনে নেব, যখন দেখব যে, ঐ সব কাজের নির্দিষ্ট ফল তোমার হাসিল হয়েছে এবং তুমি অশ্লীলতা ও অবিশ্বাস হতে মুক্ত হয়েছ, তোমার মধ্যে ন্যায় নিষ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে, তুমি কলহ-বিবাদ ও অশান্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছ, তোমার অন্তর ও চিন্তার মধ্যে পবিত্রতা এসেছে এবং ব্যক্তি ও জাতিগতভাবে তোমাদের সংশোধন হয়েছে। কিন্তু যার মধ্যে এ সব গুণ পাওয়া না যাবে, আমি তাকে আমার জামা'তভুক্ত মনে করব না– কারণ সে খোসা গ্রহণ করেছে, শাঁস গ্রহণ করে নি, যা গ্রহণ করা তার জন্য খোদা তা'লার অভিপ্রেত ছিল। এভাবে বাদ বাকী ইবাদত সম্বন্ধেও তিনি সার বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ইসলামের কোন নির্দেশই অকারণ নয়। খোদা তা'লা চর্ম চক্ষে দৃষ্টিগোচর হন না। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করা যায়। অতএব, ধর্মের উদ্দেশ্য শুধু হাত ও চোখের উপর কর্তৃত্ব করা নয়, বরং যখনই তা হাত এবং চক্ষুকে চালনা করে, তখনই হৃদয় ও চিন্তাধারাকে পবিত্র করার জন্য চালনা করে। যাতে মানুষের

অন্তরে এমন শক্তি সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা সে খোদা তা'লাকে দেখতে পায়, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে এবং তাঁর বাণী শুনতে পারে। সুতরাং এ সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের উন্নতির জন্য একটি পথ বের করেছেন। ফলে একটা ক্ষুদ্র জামা'তের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা এমন এক জামা'ত যা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং ইসলামের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক রাজত্ব স্থাপনের জন্য সর্বপ্রকার আত্মত্যাগ করতে আরম্ভ করেছে।

আপনারা চিন্তা করে দেখুন, কোথায় এক ক্ষুদ্র আহমদী জামা'ত আর কোথায় সমস্ত মুসলমানদের এক বিরাট দল। কিন্তু ইসলামের উন্নতি এবং প্রচারের জন্য আহমদীয়া জামা'ত যা কিছু করছে, তার তুলনায় সহস্রগুণে সংখ্যাগুরু অবশিষ্ট মুসলমানের দল তার অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ কাজও কি করছে? কেন এ পরিবর্তন ঘটল? একমাত্র এ কারণে যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আহমদীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দাও। আহমদীগণ এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে, তাই নামায পড়ে, একজন সাধারণ মুসলমান সে নামায পড়ে না। নামাযের আকার উভয়ের একই। নামাযের কলেমাগুলো এক, কিন্তু শাঁস ভিন্ন। আহমদীগণ নামায পড়ে নামায হিসেবে এবং আল্লাহ তা'লার সাথে ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনের জন্য। হয়ত কেউ বলতে পারে: "তবে কি অন্যরা খোদার সাথে নৈকট্য বৃদ্ধির জন্য নামায পড়ে না?" উত্তরে আমি বলব, কখনও না। আপনি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, দুর্ভাগ্যবশত: ইদানিং মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে, খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সৃষ্টি হতে পারে না। সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ ভুল ধারণা জন্মেছে যে, খোদা তা'লা এখন আর বান্দার সাথে কোন বাক্যালাপ করেন না এবং বান্দা খোদা তা'লাকে কোন কথা মানাতে সক্ষম নয়। শতাধিক বছর হতে মুসলমানগণ খোদা তা'লা হতে ইল্হাম অবতীর্ণ হবার বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়েছে। ইতোপূর্বে মুসলমানদের মধ্যে ঐ সব লোক ছিলেন, যারা ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হবার বিষয়ে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতেন। শুধু বিশ্বাসই করতেন এমন নয় বরং তারা দাবি করতেন যে, খোদা তা'লা তাঁদের সাথে কথোপকথন করে থাকেন। কিন্তু শতাব্দী কাল যাবত মুসলমানদের উপর এ বিপদ নেমেছে যে, খোদার বাণী প্রচলিত থাকা তারা এখন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসেছে। এমন কি কোন কোন আলেম সত্যের প্রকাশকে কুফরী সাব্যস্ত করছেন। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আগমন করে পৃথিবীময় প্রচার ও দাবি করলেন : "খোদা তা'লা আমার সঙ্গে কথা বলেন।" তিনি আরও বললেন : "যারা আমার অনুগমন করবে, আমার পদাঙ্কানুসরণ করবে ও নির্দেশ মান্য

করবে, খোদা তা'লা তাদের সঙ্গেও কথা বলবেন।" তিনি অবিরত খোদা তা'লার নিকট হতে প্রাপ্ত বাণী পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং স্বীয় অনুগামীদিগকে অনুপ্রাণিত করলেন, যেন তারা খোদা তা'লার নিকট হতে এ পুরস্কার পেতে চেষ্টা করে। তিনি বলেছেন, মুসলমান দৈনিক পাঁচ বার খোদা তা'লার নিকট এ প্রার্থনা করে থাকে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ– 'হে খোদা! তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও ঐ সব লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ [অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের পথে পরিচালিত কর (সূরা ফাতেহা : ৬-৭ আয়াত)]। অতএব, এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, মুসলমানদের এ দোয়া চিরকাল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তাদের মধ্য হতে কারও জন্য উপরোক্ত রাস্তা খোলা হবে না যা পূর্ববর্তী নবীদের জন্য খোলা হয়েছিল এবং খোদা তা'লা পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন, অনুরূপভাবে আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না? মুসলমানদের অন্তরে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তা এ উপায়ে সম্পূর্ণভাবে দূর করলেন। আমি বলি না যে, প্রত্যেক আহমদীর সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য, বরং আমি বলি যে, প্রত্যেক আহমদী যে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর শিক্ষাকে সম্যক উপলব্ধি করেছে, সে শুধু ফরয আদায়ের জন্য নামায পড়ে না, বরং সে নামায এমন গভীরভাবে পড়ে যেন সে খোদা তা'লার নিকট কিছু পাওয়ার আশায় নামাযে দাঁড়িয়েছে, নিজের আন্তরিকতা দ্বারা খোদা তা'লার সাথে এক নতুন সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে খোদার কাছে উপস্থিত হয়েছে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, এ মনোভাব নিয়ে যে ব্যক্তি নামায পড়ে, তার নামায এবং অপরের নামায এক ও সমান হতে পারে না।

খোদা তা'লার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের উপর ইমাম মাহ্দী (আ.) অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন : "আমার দাবি মানার স্বপক্ষে খোদা তা'লা বহু প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাকে এ কথা বলি না যে, তুমি কেবল ঐগুলো চিন্তা করে দেখ এবং বুঝতে চেষ্টা কর। যদি প্রমাণসমূহ চিন্তা করে দেখার ও বুঝার সুযোগ না পাও, কিংবা তার প্রয়োজনবোধ না কর অথবা যদি মনে কর তোমার বিবেক তার সঠিক মীমাংসা করতে ভুল করতে পারে, তবে তোমার মনোযোগ আর এক দিকে আকর্ষণ করছি। তুমি খোদার কাছে আমার বিষয়ে দোয়া কর এবং খোদা তা'লার নিকট সঠিক নির্দেশ প্রার্থী হও এবং বল : "হে খোদা! এ ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হন, তবে আমাকে সত্য পথ দেখাও, কিন্তু যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে আমাকে তার নিকট হতে দূরে রাখ।" তিনি বলেছেন, যদি

কেউ সত্য মন নিয়ে এবং বিদ্বেষমুক্ত হয়ে খোদার নিকট এভাবে কিছুদিন দোয়া করে, তবে নিশ্চয় তার জন্য হেদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং আমার সত্যতা তার নিকট দেদীপ্যমান হয়ে উঠবে। সহস্র মানুষ এ পন্থা অবলম্বন করে খোদার নিকট হতে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন। এটা কত জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মানুষ নিজে বুঝতে ভুল করতে পারে, কিন্তু খোদা তা'লা কখনও স্বীয় পথ-প্রদর্শনে ভুল করতে পারেন না। নিজের সত্যতার প্রতি কত অটল বিশ্বাস সে ব্যক্তির, যিনি নিজের দাবির সত্যতা যাচাই করার জন্য লোকের সামনে এরূপ ঐশী পন্থা পেশ করেন!

কোন মিথ্যাবাদী কি এটা বলতে সাহস পাবে যে, যাও স্বয়ং খোদার নিকট গিয়ে আমার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। কোন মিথ্যাবাদী কি এটা কল্পনা করতে পারে যে, মীমাংসার এরূপ পন্থা তার পক্ষে শুভ হবে? যে ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রেরিত না হয়ে মীমাংসার এ পন্থা মেনে নেয় সে প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেয় এবং নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সবসময় দুনিয়ার নিকট প্রকাশ করেছেন : "আমার নিকট হাজার হাজার প্রমাণ আছে, কিন্তু যদি তাতে তোমরা সন্তুষ্ট হতে না পার, তবে আমার কথা গ্রহণ করো না, আমার বিরোধীদের কথাও গ্রহণ করো না; খোদা তা'লার নিকট যাও এবং জিজ্ঞেস কর যে, আমি সত্যবাদী কিনা। যদি খোদা তা'লা বলে দেন যে, আমি মিথ্যাবাদী, তবে নিশ্চয় আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি খোদা তা'লা বলে দেন যে, আমি সত্যবাদী তবে আমার সত্যতা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন?"

হে আমার প্রিয়গণ! মীমাংসার জন্য এটা কেমন সরল, সহজ ও সত্য পথ। হাজার হাজার মানুষ এ উপায়ে উপকৃত হচ্ছে এবং এখনও যারা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে চান তারা উপকৃত হতে পারে।

মীমাংসার এ পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে হিকমত ছিল যে, তিনি পার্থিবতার উপর ধর্মকে প্রবল জানতেন। তিনি বলতেন, জড়বস্তু দেখার জন্য খোদা তা'লা আমাদেরকে চক্ষু দিয়েছেন, জড় বিষয় বুঝার জন্য বুদ্ধি দিয়েছেন। জড় পদার্থকে দৃশ্যমান করার জন্য সূর্য এবং অসংখ্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কিভাবে এটা সম্ভব যে, আধ্যাত্মিক হেদায়াতের জন্য তিনি কোন ব্যবস্থা করবেন না? নিশ্চয়, যে কোন সময়, যে কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক বস্তু দেখার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে, তিনি তার জন্য সেটির দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'লা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا *

অর্থাৎ– যে কেউ আমাদের সাথে মিলিত হবার বাসনা নিয়ে পরিশ্রম সহকারে কাজ করে, আমরা নিশ্চয় তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি (সূরা আনকবুত : ৭০ আয়াত)।

মোট কথা এই যে, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দানের ব্যবস্থা নিজ জামা'তের জন্য যেভাবে উন্মুক্ত করেছেন, তেমনি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখেও উপস্থিত করেছেন। আমাদের খোদা চিরঞ্জীব। তিনি আজও বিশ্বের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিধানের পরিচালনা করছেন। বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ তা'লার সাথে উত্তরোত্তর অধিকতর সংযোগ স্থাপন করা এবং নৈকট্য লাভ করা অবশ্য কর্তব্য। যার নিকট এখনও আল্লাহ তা'লার হেদায়াত প্রকাশিত হয় নি, তার কর্তব্য আল্লাহ তা'লার নিকট জ্যোতি: প্রার্থনা করা এবং ঐ জ্যোতির সাহায্যে সত্যে উপনীত হতে চেষ্টা করা। সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও দাবি হল মানবের সংশোধন করা এবং মানব সমাজকে পুনরায় খোদা তা'লার দিকে নিয়ে যাওয়া। তাঁর দায়িত্ব হল, যারা খোদা তা'লার সাথে মিলিত হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হচ্ছে, তাদের হৃদয়ে খোদা-মিলনের বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং ঐরূপ জীবনের সাথে মানুষকে পরিচিত করা যেরূপ জীবন মূসা (আ.) এবং অন্যান্য নবীদের সময়ের লোকেরা লাভ করতে পেরেছিল।

হে প্রিয়গণ! প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করে দেখ, পুনরায় নিজ পূর্ব-পুরুষদের ইতিহাস পাঠ করে দেখ। তাদের জীবন কি জড়বাদী ছিল? তাঁদের সব কাজ কি শুধু জড় উপকরণ দ্বারা চলত? তাঁরা খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য দিবা-রাত্রি চঞ্চল থাকতেন। তাঁদের মধ্যে যারা কৃতকার্য হচ্ছিলেন, তারা খোদা তা'লার মোজেযা এবং খোদা তা'লার নিদর্শনসমূহ লাভ করতেন। এটাই ছিল সে মহিমান্বিত জীবন যার গৌরবে তাঁরা অন্য জাতির ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং অপরাপর জাতির তুলনায় মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য কি? যদি কোন বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে ইসলামের প্রয়োজন কি? প্রকৃতপক্ষে বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু মুসলমানগণ তা ভুলে গিয়েছে। উক্ত বৈশিষ্ট্য হল, একমাত্র ইসলামের জন্য খোদার বাণী সচল আছে এবং থাকবে। ইসলামের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে খোদার সাথে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। রসূলে করীম (সা.)-এর ফয়েযান বা কল্যাণের অর্থ এটাই। তাঁর কল্যানের অর্থ এটা নয় যে, তুমি বি.এ; এম.এ পাশ কর। একজন খ্রিষ্টান কি বি.এ; এম.এ পাশ

করে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণের অর্থ এটা নয় যে, তুমি এক বিরাট কারখানা চালিয়ে ধনশালী হও। খ্রিষ্টান হিন্দু শিখ কি কারখানা চালায় না? রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের অর্থ এটা নয় যে, তুমি এক বিরাট বাবসা-বাণিজ্য চালাবে এবং বিদেশে দূর-দূরান্তে তোমার কারবার চলবে। এ সমস্ত কাজ হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং ইহুদীরাও করছে। রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের প্রকৃত অর্থ হল, তাঁর মাধ্যমে যেন খোদা তা'লার সাথে মানুষের সত্যিকার সংযোগ স্থাপিত হয়, মানব-হৃদয় আল্লাহ তা'লার দর্শন লাভ করে এবং তার আত্মা খোদা তা'লার সাথে মিলিত হয়। সে খোদা তা'লার সুমধুর বাণী শ্রবণ করে এবং খোদা তা'লার নিত্য নতুন নিদর্শনসমূহ তার স্বপক্ষে প্রকাশ পেতে থাকে। এটা সেই অমূল্য রত্ন যা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্ব না করলে কেউ পেতে পারে না। এটা সে বিষয় যাদ্বারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসারীগণ অপর জাতিসমূহের উপর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। সুতরাং হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুসলমানদের দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষণ করেছেন; এবং তাকেই তিনি বিরুদ্ধ-বাদীদের সম্মুখে তুলে ধরে বলেছেন : "এ হারান মুক্তা খোদা তা'লা আমাকে দিয়েছেন, এ বিনষ্ট সম্পদ আল্লাহ তা'লা আমাকে প্রদান করেছেন এবং এ সব দানের সবকিছুই কেবল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণে এবং তাঁর অনুবর্তিতার ফলে আমি প্রাপ্ত হয়েছি। তাঁর কল্যাণেই আমি এ সম্মানের অধিকারী হয়েছি।" হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এতদভিন্ন আরও বহুবিধ কাজ করেছেন। কিন্তু সেগুলোর গুরুত্ব আংশিক ও আপেক্ষিক। অবশ্যই, সে কাজগুলোও বিরাট ও মহা গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি, তাঁর আসল কাজ ছিল **ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দান করা এবং পার্থিবতার উপর আধ্যাত্মিকতাকে প্রবল করার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করা।** অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয়ের এটাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়। অবশ্যই তোপ, কামান দ্বারা আমরা নিজ দেশ রক্ষা করব এবং কোন শত্রুকে এটা দ্বারা দমনও করব। কিন্তু ইসলামের যে বিজয় সারা বিশ্বব্যাপী হবে তা একমাত্র এ আধ্যাত্মিক উপায়েই আসবে। এটারই প্রতি হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যখন মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান হবে, ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করবে, যখন আধ্যাত্মিক বিষয়কে জাগতিক বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিবে, তখন এ বিলাসিতাপূর্ণ জীবন, যা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে, স্বাভাবিকভাবেই দূর হবে এবং লোকে কারো অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজ তাকিদেই সব অনাচার ত্যাগ করে পবিত্র জীবন যাপন করতে থাকবে। তখন

তার কথার প্রভাব সৃষ্টি হবে এবং তার প্রতিবেশী তাকে অনুকরণ করতে আরম্ভ করবে। খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণ মক্কাবাসীগণের মতই বলতে থাকবে : لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ, হায়! তারাও যদি মুসলমান হত! এরূপ বলতে বলতে, মক্কাবাসীদের ন্যায় তাদের কথা কার্যে পরিণত হবে এবং কালক্রমে তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। কারণ উত্তম বিষয় হতে দূরে অধিককাল কেউ থাকতে পারে না। প্রথমে বিষয়টি ভাল লাগে, পরে তা পেতে লোভ হয়, তারপর পাবার চেষ্টা আরম্ভ হয় এবং ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত তার সাথে মিলিত হয়। এখনও এরূপই হবে। প্রথমে ইসলাম মুসলমানগণের অন্তরে প্রবেশ করবে, পরে তাদের শরীরে চালিত হবে। তখন অমুসলমানগণ এরূপ খাঁটি মুসলমানদের নকল করতে আরম্ভ করবে এবং সব পৃথিবী মুসলমান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং ইসলামের আলোক ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

হে আমার প্রিয়গণ! এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিস্তারিত দলীলসমূহ বর্ণনা করতে পারছি না এবং আহমদীয়াতের বাণীর সব বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করতে পারছি না। আমি সাধারণভাবে আহমদীয়াতের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করলাম এবং আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, আপনারা এ প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং বিবেচনা করে দেখুন যে, পৃথিবীতে ধর্মীয় আন্দোলন কখনও শুধু পার্থিব উপায়ে জয়যুক্ত হয় নি। ধর্মীয় আন্দোলন আত্মশুদ্ধি, প্রচার এবং আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই সর্বদা জয়যুক্ত হয়েছে। আদম (আ.)-এর সময় হতে আজ পর্যন্ত যা হয় নি তা এখনও হবে না। যে ধারায় খোদা তা'লার বাণী আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে আসছে, সে ধারাতেই এখনও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পয়গাম (আহবান) দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং নিজ আত্মার প্রতি, নিজ সন্তানের প্রতি, নিজ খান্দান এবং নিজ জাতির প্রতি এবং নিজ দেশের প্রতি কৃপা করে খোদা তা'লার পয়গাম শুনতে এবং বুঝতে চেষ্টা করো, যেন আল্লাহ তা'লার কল্যাণের দ্বার অতি শীঘ্র তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ইসলামের উন্নতি পিছিয়ে না পড়ে। আমাদের সম্মুখেও বহু কাজ পড়ে আছে। সেজন্য হে পথিক! আমরা আপনার আগমনের আশায় অপেক্ষা করছি। কারণ ঐশ্বরীক উন্নতি মোজেযা ছাড়া ধর্ম-প্রচারের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে। আসুন আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে এ প্রচারের দায়িত্ব পালন করি। কারণ ইসলামের উন্নতির এ দায়িত্ব পালন করা একান্ত কর্তব্য। এ পথে আত্ম-ত্যাগ করতে হবে। গ্লানি, নিন্দা, অত্যাচার অবশ্যই সহ্য করতে হবে। খোদার রাস্তায় মৃত্যু বরণ করাতেই প্রকৃত জীবন লাভ হয়। এ মৃত্যুবরণ না করলে কেউ খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ

করতে পারে না। এ মৃত্যুকে বরণ না করলে ইসলামও জয়যুক্ত হতে পারবে না। সাহস সঞ্চয় করুন, মৃত্যুর এ পেয়ালা মুখে তুলে ধরুন যেন আমাদের ও আপনার মৃত্যুতে ইসলাম জীবনপ্রাপ্ত হয় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্ম নতুন জীবন লাভ করে এবং এ মৃত্যুকে বরণ করে যেন আমরা আমাদের প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভ করে অনন্ত জীবন লাভে ধন্য হই। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রার্থনা কবুল কর।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

AHMADIYYATER PAIGAM

(Message of the teachings of Ahmadiyya Jamaat)

By

Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad[RA]

Khalifatul Masih Sani & Musleh Maud

© Islam International Publications Ltd.

ISBN 978-984-991-212-5

9789849912125